গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৬ - ১২ জানুয়ারি, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিদ্যুৎগ্রাহকদের অনশন আন্দোলনের সমর্থনে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাল এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঃ

‘‘কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন ‘অ্যাবেকা’ ৩ জানুয়ারি থেকে কৃষকদের যে আমরণ অনশনের কর্মসূচি নিয়েছে, আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

আমরা লক্ষ্য করছি পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম চালিত সরকার দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে যেমন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে, তেমনই কৃষকদের উপরও তীব্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। ইতিমধ্যেই কৃষকরা সার ও কীটনাশকের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিতে, খাজনাবৃদ্ধি ও পঞ্চায়েতী ট্যাক্সের চাপে জর্জরিত। এই অবস্থায় ডিজেল ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে এসেছে। ভারতবর্ষে যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ২ঃ৫ একর পর্যন্ত জমিতে কৃষকরা বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ পায়, পরবর্তী স্তরে ইউনিট প্রতি ২০ পয়সা হারে মূল্য দিতে হয়, পাঞ্জাবে ২৫ পয়সা, কর্ণাটকে ৪০ পয়সা, হরিয়ানা-গুজরাট-হিমাচল প্রদেশে ৫০ পয়সা দিতে হয় প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য — সেখানে এ রাজ্যে কৃষকদের ইউনিট প্রতি প্রায় ৩ঃ৫০ টাকা দিতে হয়।

তিনের পাতায় দেখুন

জমি লুঠের মোচ্ছব চাষীরা কিছুতেই মেনে নেবে না

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর হাতে বিরাট পরিমাণ কৃষিজমি তুলে দেওয়া নিয়ে শোরগোল পড়লেও বাস্তবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গত কয়েক বছর ধরেই নগরায়ন বা আঞ্চলিক উন্নয়নের নাম করে বিপুল পরিমাণ জমি চাষীর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। চাষযোগ্য জমি তো বটেই, এমনকী দু'ফসলী তিন ফসলী জমি, বাস্তুভিটের জমি পর্যন্ত দখল করা হয়েছে। চাষীর কান্না, ভিটেহারা মানুষের কান্না শোনার ফুরসৎ নেই মন্ত্রী-আমলাদের তথা সিপিএম নেতাদের। বরং বাস্তব সত্য হল, চাষীর কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে তা হাতবদল করার মধ্যে ফাটকাবাজী করে এঁদের অনেকেই আজ কোটিপতি বনে গেছেন। ১৯৭৯ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করে। তারপর দলীয়ভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে গড়ে তোলা হয় হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, দীঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, খড়্গপুর-মেদিনীপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ইত্যাদি। এছাড়াও শিলিগুড়ি, কল্যাণী, দুর্গাপুর প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বড় শহরের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলকে চিহ্নিত করে তার উন্নয়নের নামে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি করে বডি গঠন করা হয়। উপরোক্ত আইনে এইসব কমিটির হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কর, খাজনা, সেস বসানোর। জমির চরিত্র পরিবর্তনের (চাষযোগ্য থেকে বাস্তুতে, বা শিল্প-বাণিজ্যে ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে) জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা ধার্য করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জমি নামমাত্র মূল্যে অধিগ্রহণ করে এইসব উন্নয়ন-কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হয়ে বসার পর এই সংস্থাগুলি ব্যাপক আর্থিক লেনদেনের ফাটকা ব্যবসার এক একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। হলদিয়ায় ২৭ টাকা ডেসিম্যাল দরে কেনা জমি ৫০ হাজার টাকা দরে বিক্রি করেছে তারা। বিপুল বৈভবে ফুলে-ফেঁপে সেই অর্থ বিনিয়োগে মুনাফাবাজি করে নজির গড়েছে। এমনকী শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে ১ কোটির বেশি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধরা পড়ায় সম্প্রতি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কেচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান সিপিএম নেতা লক্ষ্মণ শেঠ অব্যাহতি চেয়েছেন এই অজুহাতে যে তখন চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁর দলেরই সূর্যকান্ত মিশ্র।

কিন্তু সিপিএম দলের সাংসদ লক্ষ্মণবাবু বলতে পারবেন কি, তাঁর ঐ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের থাবায় কত হাজার চাষী জমি হারিয়েছেন, ভবঘুরে জীবনে পতিত হয়ে স্রোতের পানার মতো ভেসে গেছেন? আর কত কোটি টাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে মুনাফা করেছে বা পরোক্ষে কত কোটি টাকা কোন্ কোন্ নেতার তহবিলে, এবং কত কোটি টাকা কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী বা কন্ট্রাক্টরদের তহবিলে জমা পড়েছে? এই লোভেই কি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চৌহদ্দি বাড়িয়ে হলদিয়া-তমলুক ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন তাঁরা, যার সীমা হবে পুরো হলদিয়া এবং তমলুক মহকুমার সমস্ত গ্রামাঞ্চল? ইতিমধ্যে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির হাতে হলদিয়া ও নন্দীগ্রামের ১৭ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, আরো ৪ হাজার একর জমি পরের ধাপে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ২৫০০ একর জমির ৭টি মৌজা নন্দীগ্রামে অধিগ্রহণের

চারের পাতায় দেখুন

বেআইনি জমি হস্তান্তরের তদন্ত দাবি করলেন প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

‘‘জনমতের তোয়াক্কা না করে শিল্পায়নের নামে অতি সস্তা দামে রাজ্য সরকার গরিব কৃষকদের জমি দখল করে, তাতে বাড়ি তৈরি করে তা বেশি দামে বিক্রি করে অত্যধিক মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিয়েছে সালিম-সিপুত্রা গোষ্ঠীকে।

‘‘এখন জানা যাচ্ছে, রীতিনীতি অনুযায়ী কোন টেন্ডার না ডেকেই জমি হস্তান্তর করে সালিম গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারের এই অনৈতিক ও বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আমরা অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।’’

পরিবহন কর্মীদের ধর্মঘটে নিউইয়র্ক শহর অচল

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের সংবাদমাধ্যমগুলি এবং বহু বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী আন্দোলন- ধর্মঘটের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, ওইসব দেশ উন্নতি করতে পেরেছে, কারণ ওখানে আন্দোলন-ধর্মঘট হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, এঁরা কি ইউরোপ-আমেরিকার সত্যিই কোন খবর রাখেন, নাকি জেনেশুনে অসত্য প্রচার করেন? ঐ মহাদেশগুলির দেশে দেশে মালিকী শোষণ, লুণ্ঠন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণ যেভাবে বিশাল বিশাল আন্দোলন-ধর্মঘট করে চলেছে, তার কিছু কিছু সংবাদ তো প্রকাশিতও হচ্ছে। সেখানে শ্রমিকের রক্ত ঝরছে, তারা মার খাচ্ছে — তবু প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ব্রিটেনে তো বটেই, সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকেও শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। একচেটিয়া পুঁজির হৃৎপিণ্ড আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গত ২০ নভেম্বর থেকে তিন দিন ব্যাপী বেসরকারি পরিবহন কর্মীদের শহর অচল করা ধর্মঘট যেমন মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট অথরিটিকে পুনরায় আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করেছে, তেমনি এই শহরের বাইরে আমেরিকা সহ বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের কাছেও বার্তা পৌঁছে দিয়েছে — পড়ে পড়ে

পাঁচের পাতায় দেখুন

নারীসমাজ ও সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের আক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান নির্যাতন-ধর্ষণ-নারীপাচারের বিরুদ্ধে এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স ও যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহ্বানে

৪ - ১০ জানুয়ারি

দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ

১০ জানুয়ারি

মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল ও রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ

জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার

বেলা - ১টা।

রকসদ্-শঙ্কর-সুরেশদের কথা কে মনে রাখবে

দিল্লির নির্মীয়মান বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্সের ভিতের মাটি কাটার কাজ করতে গিয়ে ২৪ ডিসেম্বর মাটি ধসে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে মালদার ১১ জন ঠিকাশ্রমিকের। ঐ কমপ্লেক্স যথারীতি একদিন গড়ে উঠবে, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাইয়ে ওর এক একটি তলায়, মনোহারী পণ্যের বাহার জ্বলজ্বল করবে, সচ্ছল ক্রেতাদের আনাগোনায় কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে ঐ অঞ্চল, মালিকরা মুনাফা লুটবে দেদার। সেদিন কারও মনে পড়বে না ২০ বছরের জহুর আলম, কিংবা রকসদ, শঙ্কর, গান্ধী, সুরেশ, রাহুলের কথা; কেউ খোঁজও নেবে না উদয়, অজিত, অতুল অথবা ৪২ বছরের আখতারের পরিবার তখনও কীভাবে বেঁচে আছে বা আদৌ আছে কিনা। ৫০ ফুট গভীরে মাটি খুঁড়তে বাধ্য হওয়ার পরিণামে মাটি চাপা পড়ে ওদের জীবন্ত সমাধির সংবাদে মালদায় ওদের পরিবারগুলিতে যে আর্তনাদ ও হাহাকার উঠেছে তারও কোন প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে না এই বিরাট কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে।

বড়জোর দু-চারদিন ঐ শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু লেখালেখি, তারপর সব নীরব হয়ে যাবে। মৃতের পরিবারগুলির হাহাকার, আর্তনাদও একদিন থেমে যাবে, সবই অদৃষ্ট বলে গা-সহা হয়ে যাবে। দিল্লির রাজ্য সরকার এবং যে ঠিকাদারি সংস্থা ঐ শ্রমিকদের ঠিকা চুক্তিতে কাজ করতে নিয়ে গিয়েছিল — সবাই বলছে ক্ষতিপূরণ দেবে। কংগ্রেস নেতারা মৃতদের বাড়ি বাড়ি ছুটছেন সমবেদনা জানাতে। সিপিএম নেতারা দিল্লি থেকে মৃতদেহগুলি সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছেন মালদার গ্রামে। কিন্তু কেন ঐ ২০ থেকে ৪২ বছরের কর্মমুখর মানুষগুলো আজ নিথর মৃতদেহ হয়ে গেল, কার অপরাধে? এ তো শুধু ঐ ১১ জন মানুষের মৃত্যুর একটা ঘটনামাত্র নয়, মাটি কাটতে গিয়ে, ইট-ভাঁটায়, খনির ভিতরে কাজ করতে গিয়ে এদেশেরই কত স্থানে, এমনকী বিদেশেও প্রাণচঞ্চল জীবনগুলি প্রায়শই এমন লাশ হয়ে যাচ্ছে, তার কিছু খবর মাঝে মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু কেন এই লাশ হয়ে যাওয়া? কোথায় এর শেষ? এর কি কোনও সমাধান নেই? এ কি অনিবার্য? নেতা-মন্ত্রীরা এর জবাব দেবেন না। শোকপ্রকাশ, সমবেদনাজ্ঞাপন, ক্ষতিপূরণের ঘোষণা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করার নিপুণ লক্ষ্যে তাঁরা ভীষণ ব্যস্ত। এসব প্রশ্নের সত্য জবাব দিতে গেলে যে ওঁদের বিপুল গ্রামোন্নয়নের পেল্লাই বেলুন নিমেষেই চুপসে যাবে!

ভূমিসংস্কারে পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারত সেরা! কৃষি উৎপাদনেও নাকি তাই! মানুষের অবস্থা নাকি এমন সচ্ছল যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং হাসপাতালে সরকার ফি ও নানা চার্জ বৃদ্ধি ঘটালেও মানুষের কোন অসুবিধাই নাকি হয় না! গ্রাম নাকি স্বনির্ভর! কোটি কোটি টাকা খরচ করে সংবাদপত্রে ও দূরদর্শনে তার প্রচার চলছে। এই প্রচার যদি সত্য হয়, তবে গ্রামের মানুষ তা টের পায় না কেন? মাটির ধ্বস থেকে কোনক্রমে বেঁচে যাওয়া মালদারই দুলাল সরকার চোখের জল ফেলতে ফেলতে কেন বলে, 'বাবু, ভীষণ অভাব; গ্রামে কাজ নেই, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বাঁচাবো কী করে! তাই বাইরে ছুটে এসেছি একটু আয়-উপায়ের আশায়'। শুধু এই পরিবারগুলি নয়, জানা গেছে, দারিদ্রের কারণে মালদার রতুয়া ১ এবং ২নং ব্লক থেকে শুধুমাত্র এই বছরেই বাইরে কাজ করতে গিয়েছে প্রায় ২০ হাজার যুবক (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৬-১২-০৫)। কেবল মালদা নয়, রাজ্যের সব জেলারই কমবেশি প্রায় একই ছবি। গ্রামবাংলা কার্যত শ্মশানের চেহারা নিচ্ছে। কাজ নেই। দারিদ্র। মানুষ কাজের সন্ধানে ছুটছে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মুম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, আন্দামানে, কিংবা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরব ভূখণ্ডে, ইন্দোনেশিয়ায়, আমেরিকায়।

আবার, এই যাওয়া তো সাধারণভাবে যাওয়া নয়। ঠিকাদার সংস্থা নির্দিষ্ট টাকার চুক্তিতে নির্দিষ্ট দিনে কাজ করানোর জন্য এদের গ্রাম থেকে নিয়ে যায়। আর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দাস-শ্রমিকের মত এদের অমানুষিক খাটুনি খাটতে হয়। শ্রমিকদের এই খাটুনির বিনিময়ে দেদার মুনাফা লোটে ঠিকাদার সংস্থাগুলি। আনন্দবাজার পত্রিকায় কয়েকমাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করতে যাওয়া এদেশের এক শিক্ষিত বেকার যুবকের মর্মস্পর্শী করুণ আবেদন। নামমাত্র মজুরিতে অমানুষিক খাটুনি! প্রতিবাদের জো নেই, সেখান থেকে চলে আসারও তার উপায় নেই। অথচ ওখানে থাকলে তাকে অকালেই মারা পড়তে হবে। সে আবেদন জানিয়েছে — কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি তার ওখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় বাতলে দিতে পারে।

দিল্লির ভূমিধস এড়িয়ে বেঁচে যাওয়া মালদার আর্সেদ সবুজি তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানিয়েছে, 'আমরা সতর্ক করেছিলাম, আর যেন মাটি কেটে গভীরে যাওয়া না হয়; গেলেই দুর্ঘটনা ঘটবে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার কথা শোনেননি। শ্রমিকদের মাটি খোঁড়া চালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন।' পরিণামে ঘটল এই দুর্ঘটনা। এখন সূর্য ডুবে যায় সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ। দুর্ঘটনা ঘটেছে সন্ধ্যা ৬টায়। অর্থাৎ সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পরেও শ্রমিকদের কাজ করতে হয়েছে, তাও আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ ফুট গভীরে। কোন নিরাপত্তার প্রশ্ন নেই, কাজ করে যাও; তোমরা ঠিকা শ্রমিক, যতক্ষণ খাটাবো খাটতে হবে। এর নাম কর্মসংস্কৃতি। দুর্ঘটনা ঘটলে তোমরা মরে যাবে, আবার নতুন শ্রমিক আসবে। কিন্তু কোম্পানির বিপুল মুনাফা চাই। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কী চরম শোষণ-লুণ্ঠন! শ্রমিকরা যেন মানুষ নয়, ভারবাহী পশুমাত্র।

খনি শ্রমিকদের জীবনও তো এমনই নিরাপত্তাহীন। খনিতে হয় ধ্বস নামে, নয় জল ঢুকে পড়ে, কিংবা আগুন ধরে যায়। আধুনিক সভ্যতার জ্বালানি জোগায় যে কর্মমুখর শ্রমিকেরা, তারা নিমেষেই লাশ হয়ে যায় এবং তারপর কর্তারা সেগুলি উদ্ধার করে লাশকাটা ঘরে চালান করে দেয়।

কেন এমন হয়? যে শ্রমজীবী জনগণ নিজেদের নিঃশেষে নিংড়ে দিয়ে সভ্যতার ইমারত গড়ে তোলে, যারা সভ্যতার স্রষ্টা, তারা কেন পাবে না মর্যাদাময় মানুষের জীবন? তাদের জন্য কেন থাকবে না নিরাপত্তা ব্যবস্থা? মালিক-মুনাফাবাজদের মুনাফা-লালসার হাড়িকাঠে কেন তাদের প্রতিদিন বলি হতে হবে? এবং জনগণের রক্ত নিংড়ানো অর্থে গদীয়ান সরকার ও নেতামন্ত্রীরা কেন এই ব্যবস্থার প্রতিকারে এগিয়ে আসবেন না? আসলে ওঁরা জনগণের প্রতিনিধি নন, মালিকী ব্যবস্থার সেবাদাস। তাই কুম্ভীরাশ্রু এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির বাইরে যাবার ক্ষমতা ওঁদের নেই। দারিদ্রের গহ্বরে ঠেলে দিয়ে জনগণকে মালিকশ্রেণীর মর্জিমত চুক্তিতে খাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই মুনাফাচক্রের অবসান চাই। তবেই বাঁচবে শ্রমজীবী জনগণ, বাঁচবে সভ্যতা। তবেই হবে দেশের সম্পদের সুষম বন্টন, শ্রমজীবী জনতার মুক্তি।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সম্মেলন

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের সংগ্রামী ধারার প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর ২৫ বছর পূর্তি এবং ত্রয়োদশ (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৮ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শত শত সরকারি কর্মচারীর দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে প্রকাশ্য সমাবেশস্থল জেলাশাসক দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। মুখে তাদের সরকারের তল্পীবাহক সংগঠনগুলির আপসকামিতা ও কর্মচারী বিরোধী নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারের স্লোগান। রাজ্য কমিটির সভাপতি বিমল সেন ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অমলেশ মাইতিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর পরিচালনায় প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শুরু হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তপন চক্রবর্তী, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন (জেপিএ)-এর রাজ্য সহ-সভাপতি বিমল জানা, ভূমি ও ভূমিসংস্কার কর্মচারী সমিতির রাজ্য সম্পাদক অলক হুই, এপিডিআর-এর রাজ্য সম্পাদক সুজাত ভদ্র, প্রধান অতিথি বিশিষ্ট আইনজীবী অশ্বিনী সেন ও অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

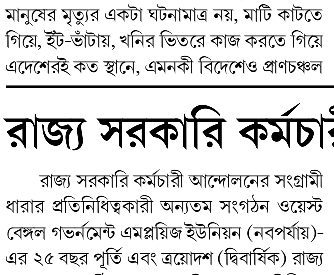

সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তপন চক্রবর্তী বলেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন কোঅর্ডিনেশন কমিটির সংগ্রাম বিমুখ, আপসকামী ধারার বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠে এই সংগঠন। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে মহার্ঘভাতা, অবসরের দিন পেনশন চালু এবং অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবি অর্জিত হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকার জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনই কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা ও মজুরি দাসত্বের অবসানের একমাত্র পথ।

জেপিএ-র রাজ্য সহ-সভাপতি বিমল জানা বলেন, ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার মুখে বিশ্বায়ন, উদারীকরণের বিরোধিতা করলেও এ রাজ্যে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের তোষণ করে নিয়ে আসছে। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীরা যদি শুধুমাত্র পেশাগত দাবিদাওয়া সংক্রান্ত আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকেন, প্রচলিত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে সামিল না হন, তাহলে তাঁদের নিজস্ব সংগঠনের সমস্যারও স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। প্রধান অতিথি অশ্বিনী সেন বলেন, কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের সমর্থনকারী রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবে কর্মচারী বিরোধী নানান পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। তারই ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাস দমনের নাম করে কর্মচারী আন্দোলনের উপর পুলিশি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির হলে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড বিমল সেনকে সভাপতি এবং কমরেড তপন চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয় আগামী দু'বছরের জন্য।

হুগলি

কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রতিরোধে পোলবা থানা সম্মেলন

কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে এবং ৩ জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচির সমর্থনে ২৪ ডিসেম্বর হুগলি জেলার পোলবা থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আলিনগর হাইস্কুল হলে। হল ছাপিয়ে গ্রাহক সমাগম হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আখতার হোসেন। সভার মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অমিতাভ রায়। প্রধান বক্তা সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির হুগলি জেলা সম্পাদক প্রদ্যোত চৌধুরী বলেন, পূর্বের বিজেপি এবং বর্তমানে কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট এবং অন্যান্য রাজ্যসরকারগুলি বিশ্বায়নের অর্থনীতিকে কার্যকর করতে ভর্তুকি তুলে দিচ্ছে। তার ফলেই ক্রমাগত বিদ্যুতের দাম বেড়ে চলেছে। অ্যাবেকার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আজ এই নীতিকে প্রতিরোধের সামনে দাঁড় করিয়েছে। ২৭ অক্টোবর এই থানার যে ৩ জন গ্রাহক সংগঠককে পুলিশি অত্যাচারে আহত হয়ে ১৪ দিন কারাবরণ করেছিলেন প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রবল করতালিতে সম্বর্ধনা জানান। বৃহত্তর আন্দোলন পরিচালনার জন্য সম্মেলন থেকে ২৭ জনের থানা কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদে এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে স্টাডি ক্লাস

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ শহরে এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে ১৭-১৮ ডিসেম্বর জেলা স্টাডি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ১৭৫ জন প্রতিনিধি এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। ক্লাস উপলক্ষে প্রতিনিধিরা সর্বহারার মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্কসবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' বইটি অধ্যয়নের ভিত্তিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন সহ ছাত্রজীবনের সমস্যা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন রাখেন। প্রথমে প্রতিনিধিরাই প্রশ্নগুলি নিয়ে চর্চা করেন। এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল বলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সমাজপ্রগতির প্রয়োজনেই করতে হবে। জ্ঞান জগতের সমস্ত শাখায় আবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ সত্যকে সংযোজিত, সমন্বিত ও সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী দর্শনের জন্ম হয়েছে। কাজেই সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান মার্কসবাদ চর্চা ও সেই আলোকে নিজেদের জীবন ও ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তমাল নন্দও বক্তব্য রাখেন।

মেদিনীপুর

বিদ্যুৎগ্রাহকদের দাবি আদায়

জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল; মেদিনীপুর শহর, বেলদা প্রভৃতি স্থানে ৩৩ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন; ডেবরা ১ ও ২নং অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ; নয়াগ্রাম ব্লকে খড়িকামাথানীতে গ্রুপ সাপ্লাই অফিস স্থাপন প্রভৃতি দাবিতে ৯ ডিসেম্বর শত শত বিদ্যুৎগ্রাহক 'ডি' জোনাল ম্যানেজার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। নারায়ণ চন্দ্র দাস, মধুসূদন মান্না, অমল মাইতি, অধ্যাপক জগমোহন পাল, ভানুরতন গুঁইন প্রমুখের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জোনাল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন দেন। আন্দোলনের চাপে তাঁর নির্দেশে সবং, পিংলা, পাঁশকুড়া, কোলাঘাটের বিল বয়কটকারী কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের কেটে দেওয়া লাইন জুড়ে দেওয়া হয়। ৩৩ কেভি সাবস্টেশন বসানো, বিল জমা দেওয়ার জন্য মেদিনীপুরে এটিএম চালু করা, হেড পোস্ট অফিসে বিল জমা দেওয়া প্রভৃতি দাবি আদায় হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তোষণনীতির জন্যই মালিকরা এত বেপরোয়া

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র নেতৃবৃন্দ

এই রাজ্যে কর্মরত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে শিল্পসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২৩ ডিসেম্বর একটি বৈঠক ডাকেন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা ও সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ঐ বৈঠকে যোগ দেন।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী কী কী বিষয়ে আলোচনা করতে চান, তা নির্দিষ্টভাবে আগে জানানো হয়নি। যদি তা করা হত, তাহলে বিষয় ধরে ধরে অভিমত ব্যক্ত করা সম্ভব হত, একথা জানিয়ে ঐ লিখিত বক্তব্যে এ রাজ্যের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের একটা ছবি তুলে ধরা হয়।

সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, যে যে কারণে কর্তৃপক্ষ তথা মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে তার সবকটিই বর্তমানে এ রাজ্যে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করছে শুধু নয়, ক্রমাগত তা বাড়ছে। রাজ্যের মালিকদের ঔদ্ধত্য বর্তমানে সীমাহীন। কথায় কথায় শ্রম আইন লঙঘন করা, ন্যূনতম মজুরি না দেওয়া, ই এস আই'র কোটি কোটি টাকা বকেয়া রাখা, পি. এফ ও গ্র্যাচুইটির টাকা না দেওয়া, বন্ধ কারখানার মেশিনপত্র প্রকাশ্যে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনাগুলি সরকার বিলক্ষণ জানে।

এ রাজ্যের মালিকশ্রেণীর এই বেপরোয়া আচরণের জন্য মূলত দায়ী রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। মালিকশ্রেণীকে অতিরিক্ত তোষণ করে তাদের অন্যায় শোষণজুলুমে সরকার মদত দিচ্ছে, রাজ্যের শ্রমদপ্তরকে সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে মালিক-ঘেঁষা নীতি নিয়ে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে "কোনরকম জঙ্গি আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না" বলে প্রতিনিয়ত যে হুমকি সংবাদপত্রে ঘোষিত হচ্ছে — তারই পরিণতিতে এ রাজ্যের মালিকরা চূড়ান্ত বেপরোয়া হয়ে শ্রমিকদের উপর লাগামহীন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে একটার পর একটা অর্জিত অধিকার। এক্ষেত্রে মালিকশ্রেণী ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রচারমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে রাজ্য সরকারের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের ভয়াবহ অবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্যে চটশিল্পে উৎপাদনভিত্তিক মজুরির চুক্তি করে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের চরম সর্বনাশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই শিল্পে সমকাজে দু'রকম বেতন চালু করা হয়েছে। চা-শিল্পেও অনুরূপ চুক্তি হয়েছে। চটশ্রমিকদের প্রাপ্য ডিএ দেওয়া হচ্ছে না। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মালিকেরা দীর্ঘদিন বেতনবৃদ্ধি ঝুলিয়ে রেখে চট ও চা শিল্পের উদাহরণ দিয়ে সেখানে উৎপাদনভিত্তিক মজুরির চুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের মৌখিক বিরোধিতার আড়ালে ফ্রন্ট সরকারও এ রাজ্যে একই নীতি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত করে চলেছে। রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলোতে হাজার হাজার স্থায়ীপদ তুলে দিয়ে কর্মী ও কর্মসঙ্কোচনের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে ঢালাও ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। মুখে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-এর বিরোধিতা করলেও এ রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদ বিভাজন ও তা বেসরকারীকরণের পক্ষে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ঘোষিত ৫২টি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি শুধু বেসরকারি ক্ষেত্র নয়, সরকারি ক্ষেত্রেও দেওয়া হচ্ছে না। সরকারি ক্ষেত্রেও আউটসোর্সিং চালু করে নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সংস্থা ডিএফআইডি'র ঋণ নিয়ে তাদের শর্তে রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিকে হয় বন্ধ অথবা বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই সমস্ত ঘটনাই বিশ্বায়নের আর্থিক নীতির পরিপূরক পদক্ষেপ। তিনি বলেন, বস্তুতপক্ষে পুঁজির চরিত্র সম্পর্কে মার্কসবাদের বুনিয়াদি ধারণার পরিবর্তন করে সরকার পুঁজিকে কল্যাণকামী রূপ দিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে দেশে ডেকে এনে অবাধে সস্তা শ্রমশক্তি শোষণের ব্যবস্থা করছে। সেজন্য দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা যেমন মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করছে, তেমনি নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতির রূপকার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ দিচ্ছেন 'সেরা মুখ্যমন্ত্রী'র শিরোপা।

রাজ্যের শিল্পসম্পর্ক কোন্ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে তার একটি জ্বলন্ত নমুনা হল, এ রাজ্যের বহু মালিক আজ অতিরিক্ত মজুরি ছাড়াই শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ন্যূনতম ১২ ঘণ্টা, এমনকী তার বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য করছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় গড়ে ওঠা স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের উপর চলছে নির্মম শোষণ। কোনরকম শ্রম আইন এখানে কাজ করে না। সরকারের আচরণ থেকে রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আজ এটা পরিষ্কার যে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আবদারের কাছে আত্মসমর্পণ করে এই সরকার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে চলছে। 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' সহ নতুন গড়ে ওঠা বহু শিল্পেও সরকার অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে। রাজ্য সরকারের মালিকস্বার্থবাহী নীতির জন্য রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে এমন ধারণা গড়ে উঠেছে যে, ইউনিয়ন করলে চাকরি থাকবে না, শ্রমদপ্তর পাশে দাঁড়াবে না, ভি আর এস, ই আর এস, লোক কমানো না মানলে সকলেরই চাকরি যাবে। অর্থাৎ একদিকে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে ভিতর থেকে মেরে দেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত শ্রমিক আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলন বা ধর্মঘট করতে সাহস পাচ্ছেন না।

ফলে সরকারি পরিসংখ্যানে ধর্মঘট কম হচ্ছে দেখা গেলেও এ রাজ্যে শিল্পসম্পর্ক স্বাভাবিক বা শ্রমবিরোধ কম, এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবের যথার্থ প্রতিফলন নয় বলেই আমাদের দৃঢ় অভিমত।

সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রমদপ্তর ও সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের মালিকঘেঁষা নীতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশের ব্যাপক দমনপীড়ন বর্তমানে গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। সম্প্রতি সল্টলেকে বিদ্যুৎভবনের সামনে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর পুলিশের আচরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এ রাজ্যে পুলিশি বর্বরতা কোন পর্যায়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমআইন মালিকরা ভঙ্গ করলে, তা দেখার জন্য যেসব ফোরামগুলি ছিল, তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মালিকের স্বার্থে পুলিশ এখন অতি সক্রিয়। রিষড়ার হিন্দুস্তান গ্লাস কোম্পানিতে শ্রমিকদের একটি গেট সভার কর্মসূচি নেওয়া হয়, দিলীপ ভট্টাচার্যের সেখানে বলতে যাওয়ার কথা ছিল। মালিক গিয়ে ঐ গেটমিটিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট মিটিং বন্ধের আদেশ দিয়ে দেন। পুলিশও সক্রিয় হয়ে গভীর রাতে দিলীপ ভট্টাচার্যের বাড়িসহ অন্যান্য শ্রমিকদের ঘরে ঘরে হানা দেয়। দিলীপবাবু পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানান, কোন্ আইনে পুলিশ গেটমিটিং ডাকার জন্য শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি হানা দিতে পারে। আর একটি ঘটনায় বাঁশবেড়িয়া চটকলে শ্রমিকসভা করতে যাওয়ার কথা ছিল প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড সনৎ দত্তের। পুলিশ ঘোষণা করে দিল, মিটিং করতে গেলে মালিকের অনুমতি চাই। এই হচ্ছে রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি, যেখানে পুলিশের অনুমতি ছাড়া শ্রমিকরা মিটিং পর্যন্ত করতে পারবে না।

মালিকশ্রেণী আজ কত বেপরোয়া, তার দৃষ্টান্ত দিতে তিনি বলেন, ডানকুনির কমল ফরজিং কোম্পানি শ্রমিকদের কোন ছুটি না দিয়ে টানা ৩০ দিন কাজ করায়, দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। ইএসআই, পিএফ কিছু নেই। এর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন আন্দোলন করায় মালিক নেতাদের ছাঁটাই করে দিল, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে মালিককেই মদত দিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভূষণ স্টীল নামে এক কোম্পানির মালিক জোর গলায় বলছে, তার কারখানায় কোনও ইউনিয়ন নেই। শ্রমিকদের মধ্যেও 'ইউনিয়ন না করার' মানসিকতা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী কোথায় 'জঙ্গি আন্দোলন' দেখতে পাচ্ছেন, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, মাসে ২০ টাকা দিয়ে পিএফ অধিকাংশ শ্রমিকই চালাতে পারছে না। এটা ফলপ্রসূ হত যদি টাকার পুরোটাই সরকার দিত। এ প্রসঙ্গে তিনি পরিচারিকাদের জন্য পিএফ চালু করার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, এঁরা অত্যন্ত গরিব ও অবহেলিত, এঁদের শ্রমিকরূপে স্বীকৃতি দিয়ে পরিচয়পত্র দেওয়া ও পিএফ চালু করা উচিত।

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের শ্রমিকবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির আরও দৃষ্টান্ত দিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকার চাইলে শ্রমিক স্বার্থে যেসব আইন প্রণয়ন করতে পারে, তা করা তো দূরের কথা, আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের যা প্রাপ্য, সেটুকুও সুনিশ্চিত করছে না। ৫২টি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব সরকার পালন করছে না, বোনাস আইন সংশোধন করছে না। রাজ্যের শ্রমদপ্তরের অধীন লেবার কমিশনার ও কারখানা ইন্সপেক্টরের বহু পদ খালি পড়ে আছে, শ্রম বিরোধের নিষ্পত্তি হচ্ছে না। বিরোধ ট্রাইবুনালে গিয়েও পড়ে থাকছে। কারণ, বিচারক নেই। অথচ সরকার নির্বিকার।

এই পরিস্থিতি স্বভাবতই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের বারুদ জমিয়েছে। ফলে রাজ্যের শিল্পসম্পর্ক পরিস্থিতিকে 'শান্তিপূর্ণ' বলে অভিহিত করা চরম মিথ্যাচার হবে। বস্তুত বর্তমান অগ্নিগর্ভ শিল্পসম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাতে হলে সর্বপ্রথমেই সরকারকে নগ্ন মালিক তোষণ ছেড়ে শ্রমিকদের কথা ভাবতে হবে।

অনশনকারীদের পাশে দাঁড়ান

একের পাতার পর

অন্ধ্রপ্রদেশে ১৬০০ কোটি টাকা এবং তামিলনাড়ুতে ১৮০০ কোটি টাকা বিদ্যুতে ভরতুকি দেওয়া হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন ভরতুকি দিচ্ছে না। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গত বছর ৩৮ কোটি টাকা এবং সি ই এস সি ১৬১ কোটি টাকা লাভ করেছে। এরপরও কৃষিতে ১০০ শতাংশ দাম বাড়িয়ে, শিল্পপতিদের বিদ্যুতের দাম কমিয়ে এবং মধ্যবিত্ত গ্রাহকদের দাম বাড়িয়ে আগামী এপ্রিল থেকে আরও বেশি লাভের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

এ রাজ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার কৃষক বিদ্যুৎ ব্যবহার করত। বর্তমানে ১০ হাজার ছেড়ে দিয়েছে। সাড়ে ছয় লক্ষ কৃষক ডিজেল চালিত শ্যালোর মাধ্যমে চাষ করে। আরও লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার এদের কাছ থেকে সেচের জল নেয়। ডিজেল ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি বোরো চাষের মুখে চাষীদের তীব্র সংকটের মধ্যে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে অধিকাংশ কৃষক শেষ পর্যন্ত জমিচ্যুত হবে, এবং সেই জমিগুলি দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিরা গ্রাস করে কৃষিতেও লুণ্ঠন চালাবে।

বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে ইতিপূর্বে চাষীরা জেলায় জেলায় আইন অমান্য, অবরোধ করেছে, বিদ্যুতের বিল বয়কট করেছে। ২৭ অক্টোবর বিদ্যুৎ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশন দিতে গিয়ে পুলিশের লাঠি, গুলি, টিয়ারগ্যাসে আহত হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কর্ণপাত করেনি। এই অবস্থা চলতে থাকলে অন্ধ্রপ্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যের মত এ রাজ্যেও হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে। ফলে নিরুপায় হয়ে কৃষকরা দাবি আদায়ের জন্য আমরণ অনশনের কর্মসূচিতে সামিল হচ্ছে। ৩ জানুয়ারি থেকে কলকাতায় মেট্রো সিনেমার বিপরীতে অনশন কর্মসূচি পালিত হবে।

গরিব কৃষকদের এই আন্দোলনের সমর্থনে আমরা সর্বস্তরের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র যুবক ও মহিলাদের এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বোলপুর কলেজে এস এফ আই-এর তাণ্ডব

১৯ ডিসেম্বর বোলপুর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন এস এফ আই ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে। এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আবেগপূর্ণ সমর্থন দেখে এস এফ আই নেতৃত্ব ভীত হয়ে নির্বাচনের একমাস আগে থেকেই সন্ত্রাসের পথ নিয়েছিল। তারা ডি এস ও-র বহু সমর্থককে মারধোর করে মনোনয়ন পত্র পর্যন্ত জমা দিতে দেয়নি। ডি এস ও প্রার্থী শৈবাল মণ্ডলকে ১৩ ডিসেম্বর পুলিশের উপস্থিতিতে তারা প্রচণ্ড মারধোর করে। এরপর তারা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ভয় দেখিয়ে এবং ভোটে ব্যাপক কারচুপি করে জয়ী হলেও মাত্র অল্প ভোটের ব্যবধানেই ডি এস ও প্রার্থীরা পরাজিত হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে এস এফ আই অধ্যাপক বিজয় দলুই, ছাত্র সংগঠক ঋত্বিক মোদক ও প্রার্থী মিঠুন সিংহরায়ের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাহায্যে অধ্যাপক দলুই রক্ষা পান। পরের দিন ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে।

উন্নয়নের নামে জমি অধিগ্রহণের আড়ালে চলছে ফাটকা কারবার

একের পাতার পর

নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে। কোথায় দাঁড়াবেন তাঁরা? কীভাবে বাঁচবেন? চাষীদের কীভাবে নির্বিচারে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এর ভয়াবহতা ধরা পড়বে।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় ৪০০ একর জমি চাষীদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে নিয়ে তার মধ্যে ২৫ একর সালিম গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে। ডোমজুড়ের ৭টি মৌজার ৩৯২ একর জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে জেলার সদর কার্যালয় স্থানান্তরের নাম করে ২৬৭০ একর জমি নেওয়া হয়েছে, যদিও কার্যালয়ের জন্য সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী জমি লাগবে মাত্র ১৩০ একর। মগরাহাট, বারুইপুর, বিষ্ণুপুর, কুলপির ৫১০০ একর জমি দেওয়া হবে সালিম গোষ্ঠীকে। বানতলা চর্মউপনগরীর জন্য ও উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত-কুলপি সংযোগ সড়ক তৈরির জন্য নেওয়া হচ্ছে ৮০০০ একর জমি। আর রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে ২৬০০০ একর জমি।

এর বাইরে আরো কয়েক লক্ষ একর জমি দখলের উদাহরণ আছে শহরে শহরে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলির দ্বারা। যেমন সম্প্রতি হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২১ হাজার একর জমি নিতে চলেছে। এবং সরকার চাষীকে নামমাত্র দাম দিয়ে এসব জমির দখল নিয়ে তারপর দলীয় লোকজনদের নিয়ে গড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছামতো টাকা মুনাফা করার সুযোগ দিচ্ছে। এমনকী দলীয় নেতারা জমির দালালির ফাটকা ব্যবসায়ী বা প্রোমোটার হয়ে বসেছে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, খোদ কলকাতার উপরে যা ঘটে গেল, অর্থাৎ রাজারহাট-নিউটাউন প্রকল্পের কথা। প্রথম দফায় ১৯৯৪ সালে রাজ্যপালের উপসচিবের আদেশনামায় [2787 LA /2/4H/11/94(WB) (ICA) 3424(2)/ 9] ঘোষিত হয় যে, তারুলিয়া, গোপালপুর, সোলুয়া, চণ্ডীবেড়িয়া, হাতিয়ারা, আর্যঘড়া, কৈখালি, তেঘরিয়া, ন'পাড়া, দশদ্রোণ, রাইগাছি, মহিষগোট, সুলুভণ্ডি, মহিষবাথান, রেকজোয়ানী, ঘুনি, বালিগুড়ি, থাকদাড়ি, চকপাকুড়িয়া, যাত্রাগাছি ও কদমপুকুর — এই ২১টা মৌজার জমি স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এই জমির পরিমাণ ২৭৫০ হেক্টর, অর্থাৎ ৬৭৯২ একর। কিন্তু সরকার দু-বছর এই জমি কেনাবেচা নিষিদ্ধ করার কোন নির্দেশ জারি করল না। ফলে ফাটকাবাজ মস্তানবাহিনী চাষীদের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে ঐ জমি নিয়ে নেয়। এর দু'বছর পরে '৯৬ সালে সরকার যখন জমি অধিগ্রহণ করল, সরকারি বাড়তি দাম চাষী পেল না, তা পেল দলেরই নেতা-উপনেতা ঐ ফাটকাবাজরা।

সেন্সাস রিপোর্ট বলছে, এর মধ্যে ২০৯৫ হেক্টর বা ৫১৭৪ একর জমি চাষযোগ্য। বিরাট অংশ দোফসলী; বর্ষায় বিঘায় ৮-১২ মণ, গরমে ২৫-২৭ মণ ধান হত। পাটসহ অন্যান্য ফসলও হত। ২১টি মৌজায় ১ লক্ষ ৩১ হাজার মানুষ ছিল। ১২৫০০ পরিবার চাষী, ৪০০০ পরিবার মাছচাষী, ৪৬৫০ ঘর ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক ছিল। শিরিষ, বাবলা, আম, কাঁঠাল গাছ ছিল ১৫ লক্ষ। এতগুলি মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের অন্নসংস্থানের ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করে কী পাওয়া গেল? একটি আধুনিক শহর। বিত্তবান সচ্ছল মানুষদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার এই ব্যবস্থাটি করে দিতে যে মানুষগুলিকে (২১,১৫০ পরিবারের ১ লক্ষ ৩১ হাজার) ভাসিয়ে দেওয়া হল দিশাহীন গন্তব্যে — তারা আজ কোথায়?

শোনা গিয়েছিল ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী নাকি চাষীর জমি কেড়ে এভাবে নগরায়নের বিরোধী। কিন্তু তিনিই পরে বারুইপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, নগরায়ন হলে যেসব পরিবার ফ্ল্যাটে আসবে, সেখানকার বাসনমাজা, ঘরমোছার কাজ, বাজারহাট করা, কাপড়কাচা, চুলকাটার কাজ তো এই চাষীরা আর তার বৌ-মেয়েরা পাবেন। বোঝা যায়, চাষীদের জন্য মন্ত্রী মহোদয় কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছেন!

এখন জনগণের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ টাকায় সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝাতে চাইছে, শিল্পের জন্য চাষীকে জমি ছাড়তেই হবে। উন্নয়নের জন্য জমি দিতেই হবে। শিল্পায়নের এই প্রচার নিতান্তই মিথ্যা। যত জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তার নগণ্য অংশেও কি শিল্প বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে বা হবে? এদেশে পুঁজির মালিকরা স্বাধীনতার পর থেকে চাষী-মজুরকে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষকে বিরামহীন শোষণ করে বিপুল পুঁজির মালিক ধনকুবের হয়ে বসেছে। ফলে চাষী-মজুর, নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত কমছে। তারা শিল্পজাত পণ্য কিনতে পারে না। তাই শিল্পে চরম মন্দা, পুঁজি নিয়োগের জায়গা প্রায় নেই। পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৪০ হাজার ছোট বড় কারখানা বন্ধ। বিপুল পুঁজি অলস। মরিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী দেশে-বিদেশে বাজার খুঁজছে। পুঁজিবাদী সব দেশেই দ্রুত ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে ব্যাপক জনগণ; পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় গড়তে সেই নিঃস্ব জনগণ পণ্য কিনতে পারে না। মার্কিন-ব্রিটিশ-জাপানি-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিশ্ববাজারের ভাগবাঁটোয়ারায় এদেশের পুঁজিপতিরা কিছু বাজার পেতে ছুটছে। ইতিমধ্যে কারিগরি উন্নতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি শিল্পে কম্পিউটারাইজড উন্নত যন্ত্র বসিয়ে শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে, উন্নত গুণমানের জিনিস কম খরচে তৈরি করে বাজার দখল করে নিচ্ছে, আরও বেশি মুনাফা লুটছে। সেইসব উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র পেতে হলে এবং বাইরের বাজার পেতে হলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে এদেশের বাজারে ঢুকতে দিতে হবে। এদেশের জনগণকে লুণ্ঠনের সুযোগ তাদেরও কিছুটা ছাড়তে হবে। এদেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সাম্রাজ্যবাদী অন্যদেশের পুঁজিপতিরা নগরায়ন সহ পরিষেবা ক্ষেত্রে (শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন-বিদ্যুৎ-সড়ক-টেলিকম ইত্যাদি) পুঁজিবিনিয়োগে বেশি উৎসাহী। কারণ গরিব মজুর-চাষী গেঞ্জি, সাবান, ওষুধ কিনতে না পারলেও, তাকে ঋণ করেও পরিষেবা ক্ষেত্রে আসতেই হবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রগুলি সরকারের হাত থেকে পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বেসরকারি মালিকানায় আনতে হবে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে, চাষী ফসলের ন্যায্য দাম না পেলে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শ্রমিকের মজুরি না বাড়ালে ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে পারে না। তাই কারখানা বন্ধ হতেই থাকবে। পাশাপাশি দু-একটি শিল্পাঞ্চল কারখানা খুললেও তা হবে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে নামমাত্র শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। এখন তাই দেশি ও বিদেশি বিপুল পুঁজি একত্রে আসছে — নগরায়ন, আবাসন, টুরিস্ট সেন্টার, শপিং মল, উচ্চবিত্তদের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার নানাবিধ ব্যাভিচার কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদিতে। এগুলি কি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শিল্প? এগুলি কি উন্নয়নের নমুনা? কার জন্য, কার স্বার্থে? ফলে শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচারটি ফানুসমাত্র — আসলে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অলস পুঁজি খাটানোর ক্ষেত্র করে দিতেই নগরায়নের পরিকল্পনা।

তাছাড়া দেশি-বিদেশি পুঁজির সম্মিলিত উন্নত প্রযুক্তির কারখানা নামমাত্র হলেও যতটুকু হচ্ছে, তার জন্য চাষীর জমি দখল করা কি অত্যন্ত জরুরি? হাজার হাজার বন্ধ কারখানার বিপুল পরিমাণ জমি হয় অকেজো হয়ে পড়ে আছে, না হয় বাতিল যন্ত্রপাতি সরিয়ে সেখানে বহুতল বাড়ি হচ্ছে। অথচ স্বাধীনতার পর কারখানা করার জন্য বহু মালিককে সরকারি জমি দেওয়া হয়েছিল। তখন চুক্তি হয়েছিল, এইসব কারখানা কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে সরকার নিয়ে নেবে। কিন্তু সেই জমি সরকার নিচ্ছে না কেন? এর গোপন রহস্য কী? বামফ্রন্টের এক প্রয়াত মন্ত্রী বলেছিলেন, এই সরকার প্রোমোটার-কন্ট্রাক্টরদের সরকার। কথাটা নিতান্তই খাটো করে বলা হয়েছিল। এই সরকার আজ দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তল্পিবাহক সরকার, তাদের প্রসাদপুষ্ট, তাদের স্বার্থবহনের জন্যই বিদেশি পুঁজি ও কারিগরিকে আমন্ত্রণ জানাতে ব্যস্ত। চাষী-মজুর আজ তাদের কার্পেটের তলার জঞ্জাল। না হলে চাষীর জমি দখল নিয়ে নগরায়ন, আবাসনই বা করতে হবে কেন, আর নামমাত্র কর্মসংস্থানের পুঁজিনির্ভর নগণ্যসংখ্যক যে শিল্প হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, তাও ঐ বন্ধ কারখানার জমিতে বা বন্ধ্যা অনুর্বর জমিতে করা হচ্ছে না কেন?

কয়েক বছর আগে হলদিয়ায় বিরাট শিল্পায়নের কথা বলে এবং লক্ষ বেকারের চাকরির স্বপ্ন দেখিয়ে পদযাত্রা হয়েছিল, হাজার হাজার যুবক কলকাতা থেকে হলদিয়া হেঁটেছিলেন বুকভরা আশা নিয়ে, সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, সিপিএমের যুব সংগঠনের সদস্য বেড়েছিল ভালই। তারপর হাজার হাজার বিঘা জমি দখল নিয়ে যে শিল্প হয়েছে হলদিয়ায়, তাতে কর্মসংস্থান হয়েছে কয়েকশ' মাত্র।

এদেশে চাষী তো পুঁজিপতিদের বাজার নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়ে ফসলের দাম না পেয়ে এমনিই মার খায়, ভিটে-মাটি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়। এখন বীজ, সার, সেচের বিদ্যুৎ বা ডিজেলের খরচ সবই ক্রমবর্ধমান। চাষের খরচ সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। তারপর, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে বিশ্বায়নের ফলে বীজের ভেল্কিতে ফসল মার খাচ্ছে। হাজার হাজার চাষী আত্মহত্যা করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি উদাসীন, নির্বিকার। তবু আশায় বুক বেঁধে চাষী চাষ করে, পেটের খোরাকের জন্য জমিটুকু নির্ভর করে বাঁচতে চায়। আক্ষেপ করে বলে, আশায় মরে চাষা। আজ সেই জমিটুকুতেও থাবা বসেছে সরকারের। কার স্বার্থে? উদ্বৃত্ত পুঁজির সঙ্কটে পড়া মুষ্টিমেয় দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে। দি স্টেটসম্যান পত্রিকা সমীক্ষা করে দেখিয়েছে, হাওড়ায় আবাসন প্রকল্পে সালিম গোষ্ঠী ৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মুনাফা লুটবে ১৯৮২ কোটি টাকা। আর উচ্ছেদ হওয়া চাষী কোথায় দাঁড়াবে, কীভাবে বাঁচবে, সে প্রশ্ন তোলাই যেন দেশদ্রোহিতা!

সম্প্রতি (১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫) সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় ''সালিমদের জমি চিহ্নিত'' শিরোনামে সংবাদে প্রকাশ, উপনগরী গড়তে সালিম গোষ্ঠীর জন্য জমি চিহ্নিত হল উত্তরভাগে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং ও বারুইপুরের মাঝবরাবর বিস্তীর্ণ ঐ এলাকায় জমি কিনে তা সালিম শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেবে রাজ্য সরকার। বড় জমির মালিক জমি বিক্রিতে রাজি না হলে সেক্ষেত্রে সেই জমি অধিগ্রহণ করবে সরকার। তবে পুরো প্রক্রিয়া চালু করতে 'ধীরে চলো' নীতি নিতে সুপারিশ করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। করলেই হিতে বিপরীত হবে। মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে। নির্বাচনী বছর। ক্ষতি হবে দলের।' সেইমতো শিল্পমন্ত্রী নিরূপম সেন, মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএম পার্টিকে বুঝিয়ে ঠিক হয়েছে নির্বাচনের পরেই জমি তুলে দেওয়া হবে সালিম গোষ্ঠীর হাতে।

এতো গেল কৌশলগত দিক। কিন্তু এই উত্তরভাগের বিপুল জমিতে কোন্ শিল্প হবে? নগরায়ন মানে কি শিল্প? পুঁজিপতিদের এই স্বার্থরক্ষা করতে চাষীর জমি কেড়ে তার পুত্র-পৌত্র-বংশধরদের পেটের ভাতের সংস্থানটুকু কেড়ে নিয়ে তাকে কী দেওয়া হবে? এর উত্তরই আজ অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন চাইছে। চাষীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছেন সর্বত্র।

জেলাশাসক দপ্তরে যুব বিক্ষোভ

বর্ধমান

সকল বেকারের কাজ ও বেকার ভাতার দাবিতে এবং অশ্লীল সিনেমা ও বিজ্ঞাপন প্রচার, মদের ঢালাও লাইসেন্স, অনলাইন লটারি, শিল্প গড়ার নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে এ আই ডি ওয়াই ও-র বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে শতাধিক যুবকের সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরে যায় এবং চারজন প্রতিনিধি জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তমাল সামন্ত, জেলা ইনচার্জ কমরেড বেলা পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রদ্যোত ব্যানার্জী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রদীপ সরকার প্রমুখ। সভার শেষে প্রতীকী মদের বোতল পোড়ানো হয়। সমগ্র বিক্ষোভ কর্মসূচি পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা নায়ক।

জলপাইগুড়ি

এ আই ডি ওয়াই ও-র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৭ ডিসেম্বর অন লাইন লটারি ও মদের লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং সমস্ত বেকারের কাজের দাবিসহ ৮ দফা দাবিতে জেলাশাসককে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রথমে সমাজপাড়া মোড়ে জমায়েত হয়ে একটি বিক্ষোভ সভা হয়। সভা পরিচালনা করেন ডি ওয়াই ও-র জেলা সহসভাপতি কমরেড অনন্ত রায়। দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কমরেড জীবন সরকার, সম্পাদক কমরেড বিজয় লোধ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মফিজুল ইসলাম, কমরেডস্ গৌরাঙ্গ বাড়ৈ, বহ্নিশিখা ভদ্র প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আজ বেকার যুবকরা যখন কাজের সন্ধানে দিশেহারা, তখন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, মারণ জুয়া অন লাইন লটারি চালু করেছে — যার বলি হিসেবে ইতিমধ্যে একাধিক যুবক সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। উত্তরবঙ্গের একমাত্র শিল্প চা-বাগান, সেগুলিও একের পর এক বন্ধ হওয়ায় চা-শ্রমিকেরা কাজ হারিয়ে অনাহারে মারা যাচ্ছে। পঞ্চায়েতি কাজ এবং এপিএল/বিপিএল রেশন কার্ড নিয়ে হচ্ছে দলবাজি। দুই শতাধিক যুবক-যুবতী দাবি ব্যানার নিয়ে শহর পরিক্রমা করে ডি এম অফিসে যান এবং ৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল দাবিপত্র তুলে দেন জেলাশাসকের কাছে।

গণহত্যাকারী রূপে চিহ্নিত হতে কত মানুষকে হত্যা করা প্রয়োজন

— নোবেল জয়ী হ্যারল্ড পিন্টার

ব্রিটিশ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার সাহিত্যক্ষেত্রে এ বছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। গত ৭ ডিসেম্বর নোবেল গ্রহণের মঞ্চটিকে ব্যবহার করে তিনি দাবি তোলেন যে, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বুশ ও ব্লেয়ারের বিচার হওয়া দরকার। অসুস্থতার জন্য অবশ্য তিনি তাঁর লন্ডনের বাড়ি থেকে সশরীরে স্টকহোমে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই ৪৫ মিনিটের ভিডিও রেকর্ডিং করে তিনি তাঁর বক্তব্য পাঠান। নিচে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

আমাদের নৈতিক অনুভূতিগুলো কি মরে গেছে? ...গুয়ানতানামো বে-র দিকে তাকাও। শত শত নির্দোষ মানুষ তিন বছরের বেশি হাজতে বন্দী। কোনোরকম আইনের বিচার ছাড়াই তারা প্রায় সারা জীবনের জন্য বন্দী জীবন কাটাতে চলেছে। জেনেভা কনভেনশনকে অগ্রাহ্য করেই এই অবৈধ পদ্ধতি চলছে। অথচ এই অসহ্য ব্যাপারটি সম্বন্ধেও বিশ্বজনমত আশ্চর্যরকম উদাসীন।

মুক্ত দুনিয়ার স্বঘোষিত নেতা একটি দেশই এই জঘন্য অপরাধ করে চলেছে। গুয়ানতানামো উপসাগরের অধিবাসীদের সম্পর্কে আমাদের কোন চিন্তা আছে কি? মিডিয়া এদের সম্পর্কে কী বলছে? মাঝে মাঝে দুয়ের পাতায় তার ছোট্ট উল্লেখমাত্র দেখতে পাওয়া যায়। তারা একটা মনুষ্যবর্জিত স্থানে আবদ্ধ হয়ে আছে যেখান থেকে বাস্তবিকপক্ষে প্রায় কেউই ফিরে আসে না। বর্তমানে তাদের অনেকেই অনশন শুরু করেছে। তাদের জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে। এদের মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকও আছে। এই জোর করে খাওয়ানোর পদ্ধতিতে কোন সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। অবশ করার বা ব্যথা কমানোর কোন ওষুধের বালাই নেই। সোজাসুজি একটা নল নাক দিয়ে বা গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে রক্তবমি। ...এতো মারাত্মক অত্যাচার। অথচ ব্রিটিশ বিদেশ সচিব এ ব্যাপারে কী বলেছেন? কিচ্ছু না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কী বলেছেন? কিচ্ছু না। কেন নয়? কারণ আমেরিকা বলে দিয়েছেঃ "গুয়ানতানামো বে-তে আমরা যাই করি না কেন, আমাদের কোন বন্ধু তার সমালোচনা করতে পারবে না। করলে তা হবে অ-বন্ধুত্বপূর্ণ কাজ। হয় তুমি আমাদের সঙ্গে, নয় আমাদের বিরুদ্ধে।" ফলত ব্লেয়ার চুপ।

ইরাকের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ এক দস্যুতাই, এক নির্লজ্জ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক আইনের চূড়ান্ত অবমাননার এ এক নিদর্শন। এই আক্রমণ এক স্বেচ্ছাচারী সামরিক আগ্রাসন, একের পর এক মিথ্যাচারই যার ভিত্তি এবং মিডিয়া ও মিডিয়া প্রভাবিত জনগণের লজ্জাজনক পক্ষপাতিত্বই যার সঙ্গী। একাজ তারা করেছে, আসলে মধ্যপ্রাচ্যের উপর আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কায়েম করার অভিপ্রায়েই। এই আক্রমণের সমস্ত যৌক্তিকতা যখন মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেল, তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে তারা 'মুক্তিদাতার' মুখোশ পরে নিল। এ হল সামরিক শক্তির এক ভয়ঙ্কর আস্ফালন, যা হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের জন্য দায়ী।

ইরাকি জনগণের জন্য আমরা এনেছি অত্যাচার, ক্লাস্টার বোমা, ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম, নির্বিচার হত্যা, দুঃখ-দুর্দশা, অধঃপতন এবং মৃত্যু। আর এটাকেই আমরা এখন চালানোর চেষ্টা করছি মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা আনার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে।

গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হতে গেলে কত মানুষকে হত্যা করার প্রয়োজন? এক লক্ষ? আমার মতে তা বড্ড বেশি। তাই বুশ ও ব্লেয়ারের আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে দাঁড়ানোই উচিত। কিন্তু চতুর বুশ আন্তর্জাতিক আদালতকে স্বীকারই করে না। তাই, কোন আমেরিকান সৈন্য বা রাজনীতিবিদকে এ ব্যাপারে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা হলেই বুশের হুমকি — তিনি সেনা নামিয়ে দেবেন। কিন্তু টনি ব্লেয়ার এই আদালতকে এখনও অস্বীকার করতে পারেননি। তাই তাঁকে অন্তত কাঠগড়ায় তোলা যেতেই পারে। তাঁকে এ ব্যাপারে সমন পাঠানোর জন্য যদি তাঁর ঠিকানাটির প্রয়োজন হয়, আমরা সেটি সহজেই সরবরাহ করতে পারি — ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট, লন্ডন।

অবশ্য মৃত্যু ব্যাপারটি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। বুশ ও ব্লেয়ার দুজনেরই বিবেক এ ব্যাপারে বেশ পরিষ্কার — মৃত্যু-ফৃত্যু বা তার সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই কমপক্ষে এক লক্ষ ইরাকি মানুষ আমেরিকার বোমা ও মিসাইলের শিকার। তবে তাতে কীই বা আসে যায়! এই মানুষগুলোর আজ আর কোন চিহ্ন নেই। তাদের অস্তিত্ব নেই। তারা শূন্য। এমনকী তারা মৃত হিসেবেও নথিবদ্ধ নয়। আমেরিকান জেনারেল টমি ফ্রাংকস তো বলেই দিয়েছেন, "আমরা লাশ গুনিনি। ওটা আমাদের কাজ নয়।"

ইরাক আক্রমণের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছবি বেরিয়েছিল, টনি ব্লেয়ার একটি ছোট্ট ইরাকি ছেলের গালে চুমু খাচ্ছেন। নীচে লেখা ছিল, "এক কৃতজ্ঞ শিশু।" কিছুদিন পর ভেতরের পাতায় একটি চার বছরের বালকের ছবি ও খবর বেরোয়। তার হাত বলে কিছু নেই। বোমা সেগুলি ছিনিয়ে নিয়েছে। তার গোটা পরিবারও মিসাইলে উড়ে গেছে। সেই একমাত্র ঘটনাক্রমে বেঁচে যায়। সে প্রশ্ন করছে, 'কখন আমি আমার হাত ফিরে পাবো?' ওর সম্পর্কে সংবাদপত্রে আর কিছু লেখেনি। টনি ব্লেয়ার তাকে কোলে তুলে নেয়নি। অবশ্য কোনো অঙ্গচ্যুত শিশু বা কোনো রক্তাক্ত শবকেই ব্লেয়ার কোলে নেননি। ওতে লোকের টাই ও ঝকমকে জামা নোংরা হয়ে যায়। দূরদর্শনে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ার সময় এসব বড়ই বেমানান।

দু'হাজার আমেরিকানের মৃত্যু অবশ্য তাদের একটু অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে। তাদের সকলকে কবরের অন্ধকারে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিরাপদ স্থানে সকলের নজরের আড়ালে তাদের গোর দেওয়া হচ্ছে। অঙ্গচ্যুতরা জীবনের বাকি সময় বিছানায় শুয়ে পচছে। মৃত ও অঙ্গচ্যুত বাস্তবে দুই-ই পচছে, শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবরে। লক্ষ লক্ষ না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও হাজার হাজার মানুষ আজ সত্যিই পীড়িত, লজ্জিত, ক্ষিপ্ত তাদের সরকারের কাজে। কিন্তু তারা এখনো কোন সুসংহত রাজনৈতিক শক্তি নয়। কিন্তু উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ও ভয় যুক্তরাষ্ট্রে আজ বেড়েই চলেছে। সেসব কমার কোন লক্ষণই এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

পরিবহনকর্মীরা আদালতের আদেশের কপি পুড়িয়েছে

একের পাতার পর

মার খাওয়া নয়, বাঁচতে গেলে চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন, ধর্মঘট, লড়াই; তবেই কর্তৃপক্ষকে নিজেদের দাবি মানতে বাধ্য করা যাবে, না হলে মালিকশ্রেণীর লুণ্ঠন-অত্যাচার হবে লাগামহীন। যে আমেরিকার 'হে' মার্কেটে শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করতে গিয়ে অত্যাচারে রক্তাক্ত হয়ে শ্রমিকের রক্তে রাঙা লাল জামাটিকে লড়াইয়ের পতাকা হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রথম তুলে ধরেছিল, সেই আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের পরিবহন শ্রমিকরা এবার বিশ্বায়নের নয়া সাম্রাজ্যবাদী নির্মমতম লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে নতুন করে সংগ্রামের আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছে।

নিউ ইয়র্কের মেয়র শহরের ধর্মঘটী পরিবহন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থা জারি করে জেলে পোরার হুমকি দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে ধর্মঘটী ইউনিয়নকে প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলার জরিমানা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যম সর্বদাই প্রচার করেছে — এই ধর্মঘটের ফলে কত কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে, গরিব মানুষ কীভাবে ভুগছেন, সাধারণ মানুষের কত কষ্ট হচ্ছে — তার বিবরণ। তবু শহরের ৩৩ হাজার ৭০০ পরিবহন কর্মীর মনোবল ভাঙা যায়নি। জনগণকেও আন্দোলন ভাঙতে নামানো যায়নি। মজুরি বৃদ্ধি, অবসরের বয়স না বাড়ানো, চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদির দাবিতে এবং পেনশন তহবিলের জন্য শ্রমিকদের মজুরি আরও কেটে নেওয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদে তারা গত ২০ ডিসেম্বর থেকে ৩ দিনের ধর্মঘটে শহরকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকা এই ধর্মঘটে ম্যানহাটনের মতো জনবহুল রাস্তাও হয়ে যায় জনশূন্য। চার শতাধিক পাতালরেল স্টেশন ছিল স্তব্ধ। শত শত ট্রেন ও বাস যাত্রীশূন্য অবস্থায় প্রদর্শনীর মত দাঁড়িয়েছিল। ১৯৮০ সালে এরকম একটি ধর্মঘট চলেছিল ১১ দিন। সেই স্মৃতি এবং দীর্ঘ বঞ্চনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ পরিবহন কর্মচারীদের মরিয়া মানসিকতায় বেসরকারী মালিকরা সহ প্রশাসন ও বিচারবিভাগ আতঙ্কিত হয়ে শাস্তির ভয় দেখাতে থাকে।

সংবাদে প্রকাশ, চলতি আর্থিক বছরে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট অথরিটি খাতা-কলমে ১০০ কোটি ডলার মুনাফা করেছে। পরিবহন ইউনিয়ন জানিয়েছে, মালিকদের আসল মুনাফা এর বহুগুণ; নানা ব্যবসা ও বারবার ভাড়াবৃদ্ধির থেকে লুণ্ঠিত বিপুল মুনাফার হিসেব ওরা গোপন করে রেখেছে। তবু এবার বার্ষিক বাজেট মিটিং-এ কর্তৃপক্ষ পরিবহন কর্মীদের জন্য কোন প্রকার মজুরিবৃদ্ধি ও সুবিধাদানের ব্যবস্থা না করেই ২০০৬ সালের বাজেট পাশ করিয়ে নিয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিবহন কর্মীদের যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল সেই চুক্তি নবীকরণের ক্ষেত্রে কর্মীদের নতুন দাবি পাছে শুনতে হয়, তাই আগেভাগেই বাজেট পাশ। কর্মী ইউনিয়ন দাবি তোলে, গত এক বছরে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও পরিবহনে ভাড়াবৃদ্ধি যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে মজুরিবৃদ্ধি না করলে উপায় নেই। অথরিটি জানিয়ে দেয় — বাজেট পাস হয়ে গেছে, ফলে নতুন কোন বরাদ্দ সম্ভব নয়। অবশ্য শেষপর্যন্ত কর্মীদের দাবি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হয়। ১৯ ডিসেম্বর চুক্তিপত্র চূড়ান্ত হবার দিন কর্তৃপক্ষ নতুন কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা অবসরের বয়স আরও বৃদ্ধি সংক্রান্ত নিজেদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় এবং কর্মচারিদের কিছুটা মজুরি বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাবি করে যে, পেনশন তহবিলের জন্য কর্মচারীদের বেতনের যেখানে ২ শতাংশ কেটে নেওয়া হত, সেখানে এবার থেকে ৬ শতাংশ এবং চিকিৎসা তহবিলের জন্য নতুন কর্মীদের মজুরির থেকে এক শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। এই ধূর্ত কৌশল ধরতে কর্মচারিদের কোন অসুবিধা হয়নি; কারণ বর্ধিত মজুরির সমস্ত অর্থই ঢুকে যাবে পেনশন ও চিকিৎসা তহবিলে; কর্মচারীদের হাতে আসবে না। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। কর্মচারী ইউনিয়ন আলোচনার টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং পরদিন ২০ ডিসেম্বর থেকে দাবি না মানা পর্যন্ত পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেয়।

ধর্মঘট ভাঙতে এবং ধর্মঘটের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে পথে নামেন স্বয়ং মেয়র। তিনি হেলিকপ্টার যোগে নিউ ইয়র্কে এসে নামেন। টিভি ক্যামেরা ও সংবাদমাধ্যমের আলোকচিত্রীদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সামনে ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে থাকেন এবং ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন, জরুরি অবস্থা জারি করে এই ধর্মঘটের সমুচিত জবাব দেবার হুমকি দেন এবং ধর্মঘটী কর্মীদের 'দুর্বৃত্ত' বা 'ক্রিমিনাল' বলে ঘোষণা করেন। আদালতেও ওঠে ধর্মঘট প্রসঙ্গ। ধর্মঘট আহ্বানকারী ইউনিয়নকে প্রতিদিনের ধর্মঘটের জন্য ১০ লক্ষ ডলার জরিমানার নির্দেশ জারি হয়। এছাড়াও ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার ডলার এবং প্রত্যেক দিনের ধর্মঘটের জন্য দুদিনের মজুরি জরিমানা হিসেবে কেটে নেবার আবেদন আদালতে জানিয়ে রেখেছেন স্বয়ং মেয়র; শ্রমিক ইউনিয়ন বিরোধী কুখ্যাত 'টেলর আইন' চালু করারও তিনি দাবি জানান। সংবাদমাধ্যমও ধর্মঘটবিরোধী প্রচারে নামে। কিন্তু ধর্মঘটী কর্মীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আদালতের আদেশের কপি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখায়, ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে। গভর্নরের অফিসের সামনে হাজার হাজার কর্মী দাবি-প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেয়। এই বার্তা বাস্তবে শুধু গভর্নরকে নয়, পুঁজির সকল সেবাদাসের উদ্দেশ্যেই ছিল সংঘশক্তির এক জঙ্গি প্রতিবাদ। তারা বঞ্চনা ও অবমাননার অবসান দাবি করে বলেছে, 'আমরা মানুষের মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে চাই।' বড়দিনের উৎসবের মুখে দিনের পর দিন ব্যবসা বন্ধ — মুনাফাবাজদের চোখে নামে অন্ধকার। অন্যদিকে পরিবহন কর্মীদের অটুট মনোবল। এই দ্বিবিধ চাপে পড়ে মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি অবশেষে হুমকির পথ ছেড়ে আবার আলোচনার প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়েছে। কর্মচারী ইউনিয়ন জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা সর্বদাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে আগ্রহী; কিন্তু সেজন্য কর্তৃপক্ষকে চালাকির পথ ছেড়ে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

পরিবহন কর্মীদের এই আন্দোলন শহরের অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর ব্যাপক প্রভাবে ফেলেছে। এই ধর্মঘট শুরুর ২৪ ঘন্টা আগেই কুইন্স কোম্পানির ৭০০ বাস ড্রাইভার — যারা প্রতিদিন প্রায় ৬০ হাজার যাত্রী বহন করে, তারা পরিবহন কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে কর্মবিরতি পালন করেছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের অন্যান্য ইউনিয়নগুলিও এই ধর্মঘটের সমর্থনে একদিনের কর্মবিরতি পালন করেছে। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নগুলিও সংহতি বার্তা প্রেরণ করেছে।

বাঙ্গালোর ঃ হাই-টেক নগরীর অন্তরালে

বাঙ্গালোর শহরে গত ১৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্মী প্রতিভা কৃষ্ণমূর্তি শ্রীকান্ত। অফিসে নিয়ে যাওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে তাঁকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ড্রাইভার শিবকুমার ধর্ষণ করে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে মৃতদেহটি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেয়।

প্রতিভা কৃষ্ণমূর্তির এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড গোটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে শুধু স্তম্ভিত করে দিয়েছে তাই নয়, দেশের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কী আকার ধারণ করেছে এবং নারীদের নিরাপত্তা আজ কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছে — এ সত্য নতুন করে আরও একবার স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

বস্তুত, বাঙ্গালোরের এই নির্মম ঘটনাটিই শুধু নয়, গোটা দেশ আজ ছেয়ে যাচ্ছে নারীদের ওপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ঘটনায়। বিকৃত লালসার শিকার হচ্ছেন ক্রমাগত আরও বেশি সংখ্যক নারী। এমনকী বৃদ্ধা ও শিশুকন্যারাও রেহাই পাচ্ছে না।

এই অবস্থায় প্রতিভা কৃষ্ণমূর্তি শ্রীকান্তের নির্মম মৃত্যুর সাম্প্রতিক ঘটনাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে একটি রূঢ় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গোটা দেশে নারী সমাজের নিরাপত্তা যখন তলানিতে পৌঁছেছে, প্রকাশ্য দিবালোকে নারীর সম্ভ্রম লুটতে দ্বিধা করছে না দুর্বৃত্তরা, তখন কোন্ ভরসায় রাতের শিফটে মহিলাদের কাজ করাবার যাবতীয় বিধিনিষেধ কারখানা আইন সংশোধন করে তুলে নেওয়া হল? পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে বিশেষত অফিস-কাছারিতে মেয়েদের কীভাবে প্রতিনিয়ত যৌন-হেনস্থার শিকার হতে হয়, সরকারের মন্ত্রী মহোদয়দের কি তা অজানা? কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এক কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে, যে কমিটির কাজ হবে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর যে যৌন-লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে, সেগুলিকে খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা। এ অবস্থায় মহিলাকর্মীদের জন্য অতিরিক্ত কোনও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দূরস্থান, প্রচলিত পুলিশি ব্যবস্থাটুকুকেও জোরদার করার কোনও চেষ্টা না করেই সরকার রাতের শিফটে মহিলাদের কাজ করাবার আইনি অধিকার মালিকপক্ষকে দিয়ে দিল কী করে?

প্রতিভার মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিপিও সংস্থাগুলির দিকেও অভিযোগের আঙুল উঠছে। বিদেশের কাজের সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে এদেশের বিপিও সংস্থাগুলিতে গভীর রাতেও কাজকর্ম চলে। সংশোধিত আইন চালু হয়ে যাওয়ার কারণে রাতের শিফটে মহিলা কর্মীদের দিয়ে কাজ করাতে এইসব সংস্থাগুলির মালিকদের আজ আর কোনও অসুবিধা নেই। এই তীব্র বেকার সমস্যার যুগে ঝুঁকিবহুল হওয়া সত্ত্বেও মহিলারা এই সংস্থাগুলিতে চাকরি নিতে বাধ্য হন। অথচ সংস্থার পক্ষ থেকে নিজস্ব কর্মীদের, বিশেষত কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও যে নেওয়া হয় না, বাঙ্গালোরের ভয়ঙ্কর ঘটনাটিই তার প্রমাণ। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ন্যায্য বেতন না দিয়ে এবং ইউনিয়ন করার অধিকার না দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মালিকরা শুধু যে নগ্নভাবে শ্রমিক শোষণ করে তাই নয়, কর্মীদের নিরাপত্তা, এমনকী মহিলা কর্মীদের প্রাণ ও ইজ্জত রক্ষার বিন্দুমাত্র দায়ও তাদের নেই। এমনকী ঘটনা পর্যালোচনা করে বাঙ্গালোর পুলিশ এ কথাও বলছে যে, নিয়োগকারী সংস্থা এইচ পি গ্লোবালসফ্ট সময় মতো ব্যবস্থা নিলে প্রতিভাকে এইভাবে মরত হত না। এতদ্‌সত্ত্বেও সেখানকার পুলিশ কমিশনার বিপিও সংস্থাটির বিরুদ্ধে কোনরকম কড়া পদক্ষেপ নেননি, ফুঁসে ওঠা জনরোষ সামাল দিতে শহরের বিপিও সংস্থাগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের কথা ঘোষণা করে দায় সেরেছেন মাত্র।

বিশ্বজোড়া উৎপাদন শিল্পে এই চূড়ান্ত মন্দার দিনে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রটিকে নিয়ে সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের মাতামাতি ইদানীং তুঙ্গে উঠেছে। দেশের শহরগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে অসংখ্য কল সেন্টার। এই শিল্পের শীর্ষস্থানে রয়েছে বাঙ্গালোর শহর। 'হাইটেক' এই শহরটির আদলে এরাজ্যের কলকাতা মহানগরীটিকে সাজিয়ে তোলার কথা প্রায়ই শোনা যায় বুদ্ধদেববাবুদের মুখে। বিপিও সংস্থাগুলি শুধু যে প্রচুর সরকারি দাক্ষিণ্য ও ছাড় পেয়ে থাকে তাই নয়, এ'সব সংস্থার কর্মীদের ইউনিয়ন গড়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করার কোনও অধিকার নেই। ধর্মঘটেরও আওতার বাইরে তারা। সরকারি নেতা-মন্ত্রী সকলের মুখে অবিরত এই একই কথা। কিন্তু বিপিও সংস্থার কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা নেই কেন, কিংবা কেন সেখানকার মহিলা কর্মীদের ইজ্জত খোয়ানোর আতঙ্কে প্রতিনিয়ত ভুগতে হবে — এই ধরনের কোনও প্রশ্ন তাঁদের তুলতে দেখা যায় না।

প্রতিভার এই নৃশংস মৃত্যু সমাজের অন্ধকার একটি দিককে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। পার্ক-ফ্লাইওভার-শপিং মল, পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্তায় এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে নগরগুলি যখন উত্তরোত্তর চূড়ান্ত আধুনিক হয়ে উঠছে তখন এই সমাজেরই অন্য একটা অংশ ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে আদিমতার অন্ধকারে। আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে নারীসমাজকে যে বর্বরতার শিকার হতে হচ্ছে, বর্বর যুগেও বোধহয় তা হতে হত না। আধুনিক শহর-নগরের উজ্জ্বল আলোর নিচে নানা মুখোশে মুখ ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিবকুমারের মতো বিকৃত মানসিকতার খুনির দল। আশঙ্কার কথা হল, এদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

প্রতিভা কৃষ্ণমূর্তির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর বাঙ্গালোরে এ আই এম এস এস এবং ডি ওয়াই ও'র বিক্ষোভ। (বাঁদিকে) এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড জয়লক্ষ্মী

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে?

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্য সমস্ত কিছুর মতো নারীদেহও একটি পণ্যবিশেষ, মুনাফা-লালসা চরিতার্থ করতে পুঁজিমালিকরা অবাধে যা ব্যবহার করে চলেছে। এখন বিশ্বায়নের পথ ধরে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিও সেকাজে যুক্ত হয়েছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসাবে যে সংস্কৃতি তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠছে, তাতেও এর ছায়া পড়ছে। তাই টিভি-রেডিও-বিজ্ঞাপনে, সাহিত্যে-সিনেমায় — সর্বত্রই চলছে নগ্নতার অবাধ প্রদর্শনী। যৌনতাকেই জীবনের সর্বস্ব বলে প্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। মদ-জুয়া-নারীমাংসের নেশায় যুবসমাজকে ডুবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করছে পুঁজিমালিকরা। এই প্রক্রিয়াতেই জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য শিবকুমার।

আমাদের দেশের মত চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদীব্যবস্থায় অল্প কিছু ধনবান মানুষ এবং অসংখ্য হতদরিদ্র মানুষের সহাবস্থান ঘটেছে। মুষ্টিমেয় ধনগর্বীর বৈভবের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে কোনক্রমে দিন গুজরান করা মানুষগুলোর। বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বল আলো অবিরত হাতছানি দিয়ে ডাকছে; বেড়ে চলেছে ভোগবাসনা। অথচ বিত্তশালী হওয়া দূরে থাক, বেঁচে থাকবার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানোই এখন দুষ্কর। চূড়ান্ত বেকার সমস্যার সামনে পড়ে দেশের যুবসমাজ আজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যাচ্ছে। মানুষ আজ আর মানুষের মতো করে বাঁচতে পারছে না। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে চরম হতাশাগ্রস্ত কিছু মানুষ শিবকুমারের মতো বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে নরপশুতে পরিণত হচ্ছে।

এদের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করতে পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে একথা সত্য, কিন্তু সেটাও আপনাআপনি হয়ে যাবে না, সেজন্যও গোটা দেশের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে এগিয়ে এসে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিপিও সংস্থার কর্মীদেরও বুঝতে হবে যে, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের এই যুগে উপযুক্ত বেতন সহ অন্যান্য দাবি আদায় করে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করতে হলে সংঘবদ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলনই এই অবস্থা থেকে বাঁচার একমাত্র গ্যারান্টি; এ নাহলে আরও শত শত প্রতিভার এভাবেই অপমৃত্যু ঘটবে। আন্দোলন করতে না দেওয়ার সরকারি ফরমান মেনে নিয়ে মুখ বুজে এই দুঃসহ পরিস্থিতি সহ্য করা নয়, ন্যায্য মজুরি সহ কর্মী-নিরাপত্তার দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলাই প্রতিভাদের অকাল মৃত্যু আটকাতে পারে।

ক্যাটরিনাবিধ্বস্ত জনগণ বাঁচার দাবি নিয়ে আন্দোলনে

সাম্প্রতিক হারিকেন ক্যাটরিনার প্রবল তাণ্ডবে আমেরিকার দক্ষিণপূর্ব উপকূলই শুধু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়নি, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিশেষ করে ধনী দেশ আমেরিকার উচ্চ নাগরিক সুযোগসুবিধা জনিত গল্পকথাটি। ঘণ্টায় ২১৬ কিলোমিটার বেগে প্রবল ঝড়ের দাপটে নিউ অর্লিয়েন্স সহ সেদেশের সমগ্র মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগর উপকূলস্থ অঞ্চলের জনজীবন সর্বাংশেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বহু মানুষ প্রাণ হারান। বাকিরা কোনও মতে শুধু ওটুকুই বাঁচাতে সক্ষম হন, বাকি সবই ভেসে যায় ঝড়জলের তোড়ে। এরপরই প্রকাশ পায় আর একটা নিদারুণ সত্য। দেখা গেল, দেশি-বিদেশি অগুণতি মিডিয়ায় ও হলিউডি পর্দায় যে মার্কিন প্রশাসনের আপৎকালীন অবস্থা সামাল দেওয়ার ও উদ্ধার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার দক্ষতার এত চিৎকৃত ঢক্কানিনাদ, সেসব নিতান্তই ফাঁপা বাগাড়ম্বর মাত্র। কার্যক্ষেত্রে সে দক্ষতার দেখা পাওয়াই ভার। দক্ষতার থেকেও আসলে প্রকট হয়ে উঠল আন্তরিকতারই অভাব।

ফলে আজ বিপর্যয় পরবর্তী আমেরিকার ঐসব অঞ্চলের দশা যা দাঁড়িয়েছে তা বস্তুত সুনামি বিধ্বস্ত আন্দামান নিকোবর বা তামিলনাড়ুর বন্যা পরবর্তী দশার থেকে খুব কিছু আলাদা নয়। বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের সেখানেও ঠিক এখানের মতোই হা-ঘরে দশা। উপযুক্ত ত্রাণ নেই, পুনর্বাসনের নামে চলছে শুধুই প্রতারণা। হাজার হাজার গরিব কৃষ্ণাঙ্গ লাতিনো মানুষ, যারা বিপর্যয়ের ফলে হয়ে পড়েছেন উদ্বাস্তু, দীর্ঘ কয়েক মাসেও আজও তারা ফিরে আসতে পারেননি নিজেদের ঘরে। সরকার থেকেও নেই।

ফলে বাধ্য হয়েই সেদেশেও আজ ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র সাধারণ মানুষকে নামতে হয়েছে পথে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে গড়ে তুলতে হচ্ছে আন্দোলন। হচ্ছে নানা মিছিল, সেমিনার। ক্যাটরিনা সত্যিই সেখানে চোখ খুলে দিয়েছে দরিদ্র বঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনো জনসাধারণের। প্রবল বঞ্চনাই তাদের এনে ফেলেছে এক জায়গায়। দাবি উঠছে সমগ্র ক্যাটরিনা বিধ্বস্ত এলাকাকে পুনর্গঠন করতে হবে। আর শুধুমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থকে সামনে রেখে সে পুনর্গঠনের কাজ চালালে চলবে না। সেখানে অগ্রাধিকার চাই ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষদের স্বার্থেরই।

এইসব দাবিকে সামনে রেখেই গত ৯ ডিসেম্বর জ্যাকসনের অ্যানডারসন ইউনাইটেড মেথডিস্ট চার্চে হয়ে গেল একদিনের সম্মেলন। সেখানে সমবেত হয়েছিলেন প্রায় ৪০০ ক্যাটরিনা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও তাঁদের কেন্দ্র করে আরও অগুনতি শ্রমিক, যুদ্ধবিরোধী ও সাধারণ জনতা। আয়োজনে ছিল পিপলস্ হারিকেন রিলিফ ফান্ড এন্ড ওভারসাইট কোয়ালিশন এবং কমিউনিটি লেবার ইউনাইটেড। সমবেত কণ্ঠে উঠল স্লোগান ঃ ''Nothing about us without us is for us'' (আমাদের বাদ দিয়ে আমাদের নামে যা কিছুই করা হোক, তা আসলে আমাদের জন্য নয়), দাবি উঠল — ক্যাটরিনার ফলে গৃহহারাদের অবিলম্বে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঝড়ে বা সামুদ্রিক নোনা জলে দূষিত হয়ে ওঠা এলাকার মাটি ও জল দ্রুত পরিশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যতদিন তা না হয় ততদিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত অস্থায়ী বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে। বিনামূল্যে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও বাচ্চাদের পড়াশুনার বন্দোবস্তও করতে হবে। শুধু তাই নয়, এলাকা পুনর্গঠনের কাজেও এইসব বাস্তুচ্যুতদের মতামত নিতে হবে এবং পুনর্গঠনের কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এইসব সহহারা মানুষদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পরদিন ১০ ডিসেম্বর নিউ অর্লিয়েন্সের রাস্তায় দেখা যায় এক প্রতিবাদ মিছিল। উপলক্ষ্য ছিল বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। ৫০০০-এরও বেশি মানুষ দৃপ্ত মিছিল করে কঙ্গো পার্কে যায়। কণ্ঠে তাদের স্লোগান, "আমরা আবার ফিরে এসেছি, আমাদের সবকিছু এবার ফিরিয়ে দাও।" পোস্টারে, ব্যানারে মুখরিত মিছিলে কারুর হাতে দেখা যায় চে গেভারার ছবি,

আটের পাতায় দেখুন

প্রয়াত কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত এক সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের সৃষ্টি

স্মরণসভায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত ১৭ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৪ ডিসেম্বর মৌলালি যুব কেন্দ্রে সংগঠনের রাজ্য কমিটির আহ্বানে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার সূচনা হয়।

প্রথমেই গভীর বেদনার সাথে গণেশ দাশগুপ্তর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যার্পণ করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সর্বভারতীয় কমিটির পূর্বতন সভাপতি কমরেড অনিল সেন। মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি ও এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, এস ইউ সি আই-এর বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী'র প্রধান সম্পাদক কমরেড রণজিৎ ধর, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কমিটির প্রেসিডেন্টকমরেড প্রতিভা মুখার্জী, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, অন্যতম সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা, কমরেড সুনীল মুখার্জী, পূর্বতন রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, সভাপতি কমরেড অনন্তলাল গুপ্তা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। গভীর ব্যথায় চোখের জলে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। কাছের মানুষকে হারানোর বেদনা কমরেড ভট্টাচার্যের কণ্ঠকে বার বার অশ্রুরুদ্ধ করে দেয়। সভাগৃহের ভিতরে ও বাইরে সকলে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে কমরেড গণেশ দাশগুপ্তের বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

রাজ্য সভাপতি কমরেড এ. এল. গুপ্তা বলেন, সংগঠনের কোন কাজকে কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত ছোট কাজ বলে মনে করতেন না। তুচ্ছ কাজও যত্নের সাথে হাসিমুখে করতেন, নিজের অমায়িক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসকে জীবন্ত করে রাখতেন। অনেকে মনে করেন, গণেশদা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অনেক কর্মীকে আমি ত্যাগ করতে দেখেছি, কিন্তু সেই ত্যাগ শ্রমিক আন্দোলনকে আজকের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, নিছক ত্যাগের আদর্শ কোন মহান আদর্শ নয়। প্রয়োজন বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত আমৃত্যু ব্রতী ছিলেন।

ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর নেতা কমরেড বরুণ গাঙ্গুলী বলেন, গণেশবাবুকে আমি মিটিং-মিছিলে যতটুকু দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, গণেশদা খুব নিরহঙ্কারী ছিলেন। এখানে এসে যা শুনলাম তাতে একথা বলতে পারি, তিনি শুধু শ্রমিকদের কাছের মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী। আজকের বিশ্বায়নের আক্রমণের যুগে এমন একজন মানুষের অনুপস্থিতি বারবার অনুভূত হবে।

এ আই টি ইউ সি নেতা কমরেড জ্যোতি লাহিড়ী বলেন, পুরনো দিনের কর্মীদের মধ্যে যে গুণাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, বর্তমান প্রজন্মের কর্মীদের মধ্যে সেই গুণাবলী গড়ে তুলতে পারলেই প্রয়াত কমরেড গণেশ দাশগুপ্তকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো যাবে।

এ আই সি সি টি ইউ নেতা কমরেড বিভাস বোস বলেন, মিটিং-মিছিলেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর অফিসে যতবার গিয়েছি, দেখেছি গণেশবাবুর হাসিমুখ। ছোটখাটো নানা প্রশ্ন করে যথাযথ উত্তর পেয়েছি। আমরা উপকৃত হয়েছি। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি হয়ে গেল। তিনি ছিলেন আদর্শের প্রতি অবিচল এক মানুষ।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, আজ আমরা সকলেই কমরেড গণেশ দাশগুপ্তের মহৎ গুণের কথা বলছি। আমাদের ভাবতে হবে, কেমন করে গণেশ দাশগুপ্ত 'গণেশদা' হলেন। গণেশদা একটা ভাল চাকরি করতেন, সে চাকরি চলে যায়। পরে দমদমে একটা চাকরি করতে করতেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসেন। তিনি সংগঠনে ব্যক্তির ভূমিকার প্রয়োজনের দিকটি উপলব্ধি করেন। আর এই উপলব্ধিই তাঁর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করে। তিনি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান হয়েও সবকিছু ছেড়ে সংগঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে এতটুকু সময় নেননি। গণেশদা'র মরদেহ যখন অফিসে নিয়ে আসি, আমি দেখেছি সমস্ত কমরেডদের চোখে জল। কমরেডদের সাথে এমনই আবেগের সম্পর্ক ছিল তাঁর। আজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, ব্যক্তিবাদ নানাভাবে মনকে প্রভাবিত করে — কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটু নাম, প্রচার, নিজের পদমর্যাদা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এসব কিছু থেকেই গণেশদা ছিলেন মুক্ত। এমনকী আমরা যখন পদ পেয়েছি, নাম করেছি — গণেশদা তাতে খুশি হয়েছেন। তাঁর তৃপ্তির হাসি দেখেছি, যা আজ বিরল। কমরেড ঘোষের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য তাঁকে এমনই এক প্রেরণা জুগিয়েছিল যা তার চরিত্রের নানা গুণকে বিকশিত করেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামই গণেশদাকে সমস্ত কমরেডদের কাছে করে তুলেছিল অত্যন্ত কাছের মানুষ, আপনজন। শ্রমিকশ্রেণীর উপর আজ যে ভয়াবহ আক্রমণ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা নামিয়ে এনেছে, তার মোকাবিলায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে একান্ত প্রয়োজন গণেশদার মত চারিত্রিক গুণাবলী, যা আমাদের অর্জন করতে হবে। সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা তা অর্জন করতে পারবো।

আজকের এই অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের যুগে যখন ব্যক্তিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও জীবনসংগ্রামকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করাই পারে গণেশ দাশগুপ্তের মত মানুষ তৈরি করতে।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, বড় ব্যথা নিয়ে আজ আমরা সকলে কমরেড গণেশ দাশগুপ্তের বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর স্মরণসভায় সমবেত হয়েছি।

মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। সমাজে জন্মের মত মৃত্যুও প্রতিমুহূর্তেই ঘটে চলেছে। প্রতিটি মৃত্যুই সমাজে একটা অভাবের সৃষ্টি করে। নতুন নতুন জন্মের ফলে সে অভাব পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা সাধারণ নন, সমাজপ্রগতির আন্দোলনে যাঁরা সামনের সারিতে এসে যান, তাঁদের মৃত্যুতে যে অভাব সৃষ্টি হয় তাকে পূরণ করতে কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। আর যাঁরা সমাজপ্রগতির পথ দেখান, ইতিহাসে যাঁরা চিন্তানায়কের ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মৃত্যুতে যে বিরাট অভাবের সৃষ্টি হয় তাকে পূরণ করতে প্রায়শই সমাজকে কয়েক যুগ পার করে যেতে হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেউই মহান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। একটা সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যুগে যুগে বড় মানুষদের সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগের বিপ্লবীরাও অর্থাৎ সত্যিকারের কমিউনিস্টরাও একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিপ্লবী হয়েছেন। সংগ্রাম ভিন্ন সত্যিকারের কমিউনিস্ট হয়ে গড়ে ওঠা যায় না। কিন্তু যেকোন সংগ্রামের দ্বারাই সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। তার জন্য ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত একটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের প্রয়োজন। সমস্ত মার্কসবাদী চিন্তানায়কেরা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সংগ্রামের এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি সৃষ্টি করে গেছেন। আমাদের দেশে সংগ্রামের এই বিশেষ প্রক্রিয়াটির জন্ম দিয়েছেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। এ সংগ্রামের মর্মবস্তুই হল বর্তমানের অতি কলুষিত ব্যক্তিবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থ — আজ যেটা সর্বহারাশ্রেণীর ও তার মুক্তির প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত — তার সাথে অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন এই সংগ্রামেরই একটি সুন্দর প্রোডাক্ট (ফসল)।

কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত স্মরণসভায় ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

গণেশবাবুর স্নেহপ্রবণ মন, অমায়িক ব্যবহার ছোট বড় সমস্ত কাজকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখা ইত্যাদি বহু গুণের কথা আপনারা শুনেছেন বা নিজেরাও জানেন, যার জন্য তিনি সকলেরই এত প্রিয় ছিলেন। কিন্তু যে অতি বড় গুণ আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি তা হল, সদা প্রফুল্ল মনে, হাসি মুখে সমস্ত কাজ নিরলসভাবে করে যাওয়া। সংগ্রামের পথে চলতে গেলে, ঘাত-সংঘাত আসে, দুঃখ-কষ্ট, বিফলতা আসে। এ সবের মাঝে মনের প্রশান্তি এবং আনন্দ রক্ষা করা বিপ্লবীদের পক্ষে অতি জরুরি, কিন্তু অতি কঠিন সংগ্রাম। মনে রাখবেন, Happy mind, searching mind and dialectical mind is the growing mind. বিপ্লবী জীবনের মহত্ত্ব এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মহান উদ্দেশ্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই কেবল এটা অর্জন করা সম্ভব হয়। গণেশবাবুর মধ্যে এই বড় গুণটিকে দেখেছি। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রামের বিফলতা — কোন কারণেই তাঁর মধ্যে যেমন হতাশা বা অসন্তোষ দেখিনি, তেমনই কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতেও কখনও শুনিনি। নিরহংকারী এই মানুষটি নীরবে হাসিমুখে অবিশ্রাম কাজ করে গেছেন। নিজের ভাল-মন্দের কথা ভেবেও দেখেননি। এ অতি বড় গুণ। আমি যে দয়া করে শ্রমিকদের উপকার করতে আসিনি, বরং নিজের মুক্তির জন্যই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছি — কারণ আমার মুক্তি আজ সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত — এই সঠিক বিপ্লবী উপলব্ধি জীবনে সত্য হয়ে উঠলেই এ গুণ আয়ত্ত করা সম্ভব। গণেশবাবু তার জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ সত্যটি অতি গভীরভাবেই পেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে আর যে বড় গুণটি আমাদের সকলেরই আয়ত্ত করা প্রয়োজন তা হল, নিজেকে জাহির না করে সংগঠন ও বিপ্লবের প্রয়োজনে নীরবে কাজ করে যাওয়া। যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রন্টে যাঁরা লড়েন, যুদ্ধ করেন নাহয় মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। কিন্তু তাঁদের কথা সকলেই জানেন। তাঁদের খ্যাতি হয়। কিন্তু যাঁরা পিছন থেকে সেই সংগ্রামের রসদ জুগিয়ে যান, তাঁদের কাজ শুধু কঠিনই নয়, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ তাঁদের কাজের উপর অনেকখানিই নির্ভর করে। সকলে তাঁদের না জানতে পারলেও ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকার মূল্য অক্ষয় হয়ে থেকে যায়। গণেশবাবু পিছনে থেকে নীরবে এই কঠিন কাজটি করে গেছেন।

আজকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পর গোটা বিশ্বে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর উপরেই নয়, সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের উপরই ভয়ঙ্কর আঘাত নেমে এসেছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতিনৈতিকতা জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করেই এই নজিরবিহীন আক্রমণ ঘটছে। পূর্ব ইউরোপের, বিশেষ করে সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের পতনের পরই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা সম্মিলিতভাবে মৃতপ্রায় ক্ষয়িষ্ণু বিশ্ব পুঁজিবাদকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সম্ভবত শেষ প্রচেষ্টা হিসাবেই বিশ্বায়নের নীতি কার্যকর করছে। একে মোকাবিলা করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। একে মোকাবিলা করার উপযুক্ত করে আমাদের প্রিয় সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীকে গড়ে তোলার অনিবার্য প্রয়োজন থেকেই

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

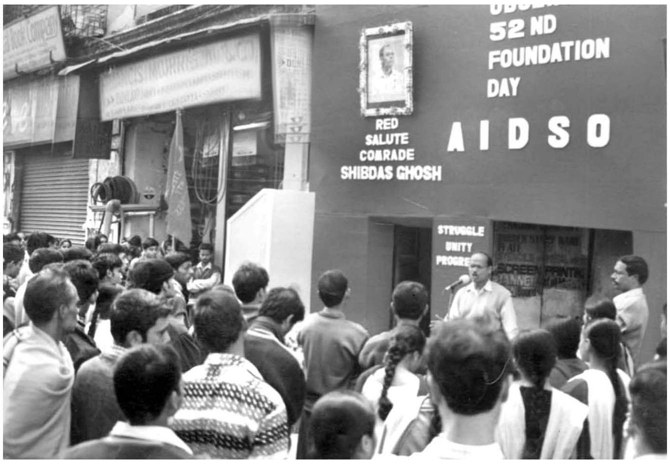

২৮ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মীসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল

পদপিষ্ট হয়ে এই মৃত্যু অনিবার্য ছিল না

আবারও ত্রাণ নিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন তামিলনাড়ুর ৪২ জন বন্যাদুর্গত মানুষ। আহত ৫০ জনেরও বেশি। অক্টোবরের বন্যায় ঘর-বাড়ি, সর্বস্ব হারিয়েছিলেন এই মানুষগুলি। এবার সরকারি ত্রাণের আশায় এসে প্রাণটুকুও দিলেন। ১৮ ডিসেম্বর, রবিবার সকাল ন'টা থেকে চেন্নাইয়ের এম জি আর নগরের একটি স্কুল থেকে ত্রাণের কুপন দেওয়ার ঘোষণা করেছিল জয়ললিতা সরকারের অফিসারেরা। রাত তিনটে থেকে স্কুলের সামনে হাজার পাঁচেক মানুষের লাইন পড়ে যায়। অল্পস্বল্প বৃষ্টি হচ্ছিলই। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে স্কুলবাড়ির দিকে ছুটে যান সবাই। ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ে স্কুলের গেট। টাল সামলাতে না পেরে সামনের মানুষরা মাটিতে পড়ে যান। পিছনের ভিড় হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ে তাদের উপর। তার ফলেই এই মর্মান্তিক পরিণতি।

কিন্তু এ ঘটনা কি অনিবার্য ছিল? মাত্র মাসাধিককাল আগেই উত্তর চেন্নাইয়ে এমনই এক ত্রাণ বিতরণের ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ৬ জন, আহত ২০ জন। অভুক্ত সন্তানের মুখে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার আশায় দুর্গত মানুষ ত্রাণ বিলির খবর পেলে যে হাজারে হাজারে ছুটে আসবে — এটাই স্বাভাবিক। নিঃস্ব মানুষগুলির দুর্দশা কোন স্তরে পৌঁছালে বৃষ্টি মাথায় মধ্যরাত্রি থেকে ত্রাণের কুপন নিতে লাইনে দাঁড়ায়, তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। প্রশাসনেরও একথা না জানার কথা নয়। তবুও কোন পরিকল্পনা কোন প্রস্তুতিই প্রশাসনের তরফে ছিল না।

বন্যা হয়েছে প্রায় আড়াই মাস আগে। এই দীর্ঘ সময়ে নিঃস্ব মানুষগুলির জন্য বলার মতো কোন ব্যবস্থাই যে সরকার করেনি, তা বোঝা যায় ত্রাণের জন্য আজও বিপন্ন মানুষের আকুতিতে। পাছে দেরি হলে ত্রাণ না মেলে, পাছে লাইনে পৌঁছানোর আগেই তা শেষ হয়ে যায়, তাই যে করে হোক আগে পৌঁছানোর মরিয়া চেষ্টা, এমনকী জীবনকেও বাজি রাখা। তাও কেবল কুপন পাওয়ার জন্য, সরাসরি ত্রাণ-সামগ্রী নয়! সামগ্রী কবে হাতে পাওয়া যাবে, আদৌ পাবে কিনা — কেউ জানে না। ঘটনার পর মৃত এবং আহত মানুষগুলির জন্য মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা যত দ্রুত ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করলেন, তার সামান্যতম তৎপরতাও যদি দুর্গত মানুষগুলির ত্রাণের জন্য ইতিপূর্বে দেখাতেন তবে হয়তো এত মানুষকে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাতে হতো না।

তামিলনাড়ুতেই দু'বার পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। গত লোকসভা নির্বাচনের মুখে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর নির্বাচনী এলাকায় শাড়ি নিতে গিয়ে এইভাবে পদপিষ্ট হয়ে গরিব মানুষের মৃত্যুর কথা অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে। সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের মুখে দেশজুড়ে উন্নয়নের ঘোষণা এবং প্রচারমাধ্যমগুলিতে তা নিয়ে প্রবল শোরগোল শুনতে শুনতে যখন দেশের মানুষের কান ঝালাপালা, তখন এই ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দেয় বাস্তবে সেই প্রচার কতখানি অন্তঃসারশূন্য। খরা, বন্যা, মহামারী আজও মানুষের নিত্যসঙ্গী। সরকারি একটু ত্রাণের জন্য দুর্গত মানুষকে আজও হাহাকার করতে হয়। ফসলের ন্যূনতম দাম না পেয়ে চাষীদের আত্মহত্যা আজ নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতিদিন শত শত মা-বোনের ইজ্জত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের বাজারে। দেশের নেতা-মন্ত্রী এবং সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কাছে আজ দেশ মানে শুধু ধনিকশ্রেণীর দেশ এবং দেশের উন্নয়ন মানে শুধু ধনীদেরই উন্নয়ন। তাই সেই উন্নয়নের রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে মরে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষ; সেই রথের গতি অবাধ রাখতে দরিদ্র মানুষের কুটির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, না হয় বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে তামিলনাড়ুর জয়ললিতা আর পশ্চিমবাংলার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দরিদ্র মানুষের প্রাণের কোন মূল্য উন্নয়নের রথের এই সারথিদের কাছে নেই। তবুও দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনের ভার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতা-মন্ত্রীদের হাতেই ন্যস্ত। কী অধিকার আছে তাঁদের এই দায়িত্ব নেওয়ার?

লিট্‌ল আন্দামানের রামকৃষ্ণপুরে মদের বার রুখতে এলাকার মানুষ আন্দোলনে

একমাত্র জনগণের বলিষ্ঠ প্রতিবাদই পারে অন্যায় ও অশুভ প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে। লিট্‌ল আন্দামানের রামকৃষ্ণপুরে মদের বার খোলার সংবাদ জানা মাত্রই এলাকার মানুষ উদ্বিগ্ন হন। এই উদ্বেগ ও অসন্তোষকে গণপ্রতিরোধে পরিণত করতে লিট্‌ল আন্দামানের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংগঠন'-এর সম্পাদক মোহন মিস্ত্রি এলাকার ছাত্র-যুবক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে ছুটে যান এবং তাদের কাছে পরামর্শ নেন কী করে এই মদের দোকান খোলাকে বন্ধ করা যায়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন — 'আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, আন্দামানে সি ডি কালচার, ব্লু-ফিল্ম, মদ-গাঁজা ও অন্যান্য নেশার অবাধ চর্চা ও কুঅভ্যাসের ফলে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষের নীতি-নৈতিকতা-সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তার উপর যদি গ্রামীণ এলাকা রামকৃষ্ণপুর বাজারের উপর 'মদের বার' খোলা হয়, তাহলে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে পারব না।' তিনি বলেন — উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্রষ্টা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজী, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচাঁদ প্রমুখ মহৎপ্রাণের সংগ্রামী জীবনচর্চাকে ভুলিয়ে দিতে শাসকশ্রেণী আজকের প্রজন্মের সামনে অপসংস্কৃতির সমস্ত উপাদান সরবরাহ করছে, যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে মাথা না তুলে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। এর বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করা হবে।

আলোচনা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে ঠিক হয়েছে এই 'বার' খোলা রুখতে ছাত্রছাত্রীসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষের প্রতিবাদ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে এবং সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমন্বয়ে গঠিত লিট্‌ল আন্দামানের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংগঠন'-এর নেতৃত্বে গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে জমা দেওয়া হবে।

ক্যাটারিনা ঃ গরিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ কর

ছয়ের পাতার পর

কারুর বা ব্যানারে উচ্চকিত দাবি, "ইরাক থেকে নিউ অর্লিয়েন্স — গরিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ কর।" মিছিল শেষে সকলে মিলিত হয় সিটি হলে, সেখানে বক্তার পর বক্তা তাঁদের দাবি তুলে ধরেন। মার্কিন সরকারকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে একজন বলে ওঠেন, "রাতারাতি সারা পৃথিবী ঘুরে ইরাকে সেনা পাঠাতে তোমাদের কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু ঘরের পাশে বিপন্ন গরিব মানুষকে উদ্ধার করা বড্ড শক্ত কাজ তো বটেই।" বাস্তবে পুঁজিবাদের এই তো চরিত্র। গরিব মানুষের কোনও মূল্যই নেই তার কাছে — তা সেই গরিব মানুষ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকেরই হোক, কিংবা ভারতের বা ধনীদেশ আমেরিকারই হোক। একথাটা ক্যাটরিনার ঘটনার পর যেভাবে আমেরিকার জনগণের চোখে স্পষ্ট হয়েছে, ইতিপূর্বে তা ঘটেনি। তাই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ক্যাটরিনা একটি গুরুতর ইস্যু হিসাবে যুক্ত হয়েছে, কারণ এটাও একটা যুদ্ধ — গরিবের বিরুদ্ধে ধনী শাসকদের যুদ্ধ।

কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত স্মরণসভা

সাতের পাতার পর

আমাদের প্রয়াত প্রিয় উপদেষ্টা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোদ্ধা, মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী আমাদের সংগঠনের রিভাইটালাইজেশন অ্যান্ড কনসোলিডেশনের জন্য যে অতি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের সেই কাজটি পূরণ করতে হবে — যাতে দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে বর্তমানের অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ এবং সুবিধাবাদের খপ্পর থেকে মুক্ত করে সত্যিকারের স্কুল অফ কমিউনিজম-এ পরিণত করা এবং শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনে একটা গতিবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। আর যে প্রভাব থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে মুক্ত করতে হবে তাহল, আধুনিক সংশোধনবাদ। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তৎকালীন ইউরোপের সবথেকে পশ্চাৎপদ দুর্বল দেশ রাশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পর এবং শ্রমিকশ্রেণীর শাসন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ১৪টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ একসাথে আক্রমণ করেও তাকে ধ্বংস করতে পারেনি। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতে যখন সমাজবাদ গড়ে ওঠার পথে, কিন্তু শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি, তখনও জার্মানি, ইতালি ও জাপানের ফ্যাসিবাদী যুদ্ধজোট সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেও তাকে ধ্বংস করতে পারেনি, বরং নিজেরাই পরাজিত হয়েছে। সেই সোভিয়েতে দেশে যখন যুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র বহুদূর বিকশিত হয়ে অতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, যাকে বাইরের আক্রমণ ধ্বংস করতে পারেনি, পারতোও না — সে ধ্বংস হয়ে গেল যখন আক্রমণ এল ভেতর থেকে, যখন আধুনিক সংশোধনবাদের আক্রমণ এল কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকরাষ্ট্রের ভেতর থেকে। কমরেড শিবদাস ঘোষই এই আধুনিক সংশোধনবাদ গড়ে ওঠার কারণ এবং তার সামগ্রিক চরিত্রকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখিয়েছেন যে, শেষ বিচারে এটা সাম্যবাদী আন্দোলনে বুর্জোয়া চিন্তার অনুপ্রবেশ ছাড়া আর কিছু নয় এবং অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদই এর গড়ে ওঠার ভিত। তাই বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে এই ব্যক্তিবাদের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে বিপ্লব গড়ে তোলাও যেমন সম্ভব নয়, তেমনই শেষপর্যন্ত বিপ্লবকে রক্ষা করাও কঠিন। আজকের শ্রমিক আন্দোলনে এ একটি অপরিহার্য সংগ্রাম। আর এ সংগ্রামের পথও কমরেড ঘোষই দেখিয়ে গেছেন। যেহেতু কমরেড ঘোষের চিন্তা আমরাই বহন করি, তাই শ্রমিক আন্দোলনকে সংশোধনবাদের হাত থেকে মুক্ত করা আমাদের একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ভারতে সর্বহারা বিপ্লব সফল হলে যে বিশ্ব-বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আজ আমরা যখন আমাদের সংগঠনের রিভাইটালাইজেশন ও কনসোলিডেশনের সংগ্রাম শুরু করেছি ঠিক সেই সময়ই শ্রমিক-বিপ্লবী সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ কমরেড গণেশ দাশগুপ্তের জীবনাবসান ঘটলো। তাঁর মৃত্যু সংগঠনের এবং শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের দেখানো যে সংগ্রামের পথ বেয়ে কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত এসেছেন, সেই সংগ্রামকে নিষ্ঠার সাথে মন-প্রাণ দিয়ে চালিয়ে যেতে পারলেই সেই পথে অসংখ্য উন্নত বিপ্লবী জীবনের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ ক্ষতি আমরা পূরণ করতে পারব এবং এই সংগ্রামের পথেই শ্রমিক আন্দোলনকে বর্তমানের অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ এবং আধুনিক সংশোধনবাদের হাত থেকে মুক্ত করে সত্যিকারের স্কুল অব কমিউনিজম-এ পরিণত করতে পারব, শ্রমিক আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করতে পারব।

কমরেড গণেশ দাশগুপ্ত লাল সেলাম

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in